নবজন্ম

আশাপূর্ণা দেবী

তুলি-কলম
১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

তুলি-কলম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৬৭
প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
১ কলেজ রো, কলকাতা-৯
মুদ্রক
ত্বিষাম্পতি দত্ত
সাক্ষর মুদ্রণী
১ কলেজ রো, কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ শিল্পী
অরুণ বণিক
দাম ৩·০০

নবজন্ম

****

বাসুলপুরের যে রাস্তাটা দেবী জয়চণ্ডীর মন্দিরের দিকে বাহু প্রসারিত করেছে, কদিন ধরে সে রাস্তায় লোক চলাচলের আর বিরাম নেই। শুধু বাসুলপুর বলেই নয়, আশপাশের তিন চারটে গ্রাম থেকে লোক ভেঙে পড়েছে চণ্ডীতলার পথে।

কিন্তু কারণটা কি?

দেবী চণ্ডী অকস্মাৎ নতুন কোনো মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন? না কি এ তল্লাটের আবালবৃদ্ধবনিতা একযোগে পরম ধার্ম্মিক হয়ে উঠলো?

না, ঠিক অতোটা নয়। ভীড়ের কারণ অন্য। অবশ্য এও এক মাহাত্ম্যেরই ব্যাপার। এ মাহাত্ম্য দেখাচ্ছেন স্বয়ং নারায়ণ! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ সশরীরে মর্তে অবতীর্ণ হয়ে বাসুলপুরের জয়চণ্ডী দেবীর নাটমন্দিরে এসে অধিষ্ঠান হয়েছেন।

কেন হয়েছেন, সে প্রশ্ন অবিশ্বাসীর। লীলাময়ের অনন্ত লীলার কারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়া মুখ্যুমি ছাড়া আর কি? আপাততঃ ধরতে হয় তিনি বাসুলপুরবাসীকে উদ্ধার করতেই নরদেহ ধারণ করেছেন।

একটি সুপুরি আর পাঁচটি পয়সার ওয়াস্তা।

ভূত ভবিষ্যৎ সব জানিয়ে দেবেন তিনি।

দেবেন সৌভাগ্যের আশ্বাস।

মাত্র দু'চার দিনের মধ্যেই লোকের মুখে মুখে এ খবর তিন চার-

খানা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। 'লোকমুখ' যে খবরের কাগজের চাইতেও দ্রুত কার্যকরী, এ তথ্য পল্লীগ্রামবাসী মাত্রেই জানেন। তাই চণ্ডীতলার রাস্তাটার এ ক'দিন আর এক মুহূর্ত্ত ছুটির অবকাশ মিলছে না। রেল লাইন ধরে রাশি রাশি লোক আসছে ভিন গাঁ থেকে, ছোট লাইনের ছোট্ট রেলগাড়ী থেকে নামছে উদভ্রান্ত লোকের দল। সবাই চলেছে চণ্ডীতলার উদ্দেশে।

চলেছে ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, ইতর ভদ্র, গরীব বড়োলোক, চলেছে সাধুসন্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কাঙালী ফকির। অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাবতীর দলও এই উপলক্ষ্যে পথে বেরোবার ছাড়পত্র পেয়েছে। স্নেহময়ী জননীরা কাঁথায় মোড়া শিশুটিকে নিয়েও চলেছেন নারায়ণের দরবারে। শিশুর ভূতকাল না থাক্ ভবিষ্যৎকাল তো আছে?

খোঁড়া গোবিন্দ বাগদীও চলেছে লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে, বামুন গোঁসাইদের গা বাঁচিয়ে। বাতে পঙ্গু চৌধুরীগিন্নীও ধাবিত হচ্ছেন গরুর গাড়ী চেপে। মোট কথা, চর্মচক্ষে একবার নরনারায়ণ দর্শন না করে কেউ ছাড়বে না। ছাড়বেই বা কেন? এ সুযোগ কি বারবার আসবে? অবিশ্যি সুশৃঙ্খল শৃঙ্খলায় কাতারে কাতারে লোক শুধু যাচ্ছে, একথা ভাবলে ভুল হবে। বিপরীতপন্থী লোকও আছে। যার জন্যে মুখর হয়ে আছে এই পথ।

যারা ভোরে ভোরে যেতে পেরেছিলো, তারা আগে ফিরছে। আসা যাওয়ার ঠেলাঠেলিতে কলরব যা হচ্ছে সে সোজা নয়। উত্তেজিত জনতা একের প্রতি অপরে যে কটূক্তি বর্ষণ করছে, সেটা নারায়ণদর্শনাকাঙ্খী, বা নারায়ণ দর্শনে ধন্য, কারো পক্ষেই শোভন নয়। কিন্তু শোভনতার সীমা বজায় রেখে চলবার দায়িত্ব জনতা নেয় না।

এই কলরব, এই কটূক্তি, এই ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ির ঝড় ছাপিয়েও আবার মাঝে মাঝে নারায়ণ মাহাত্ম্যের মন্তব্য শোনা যাচ্ছে··· 'আহা কী দেখলাম! ···নরজন্ম সার্থক।' 'জীব তরাতেই এসেছেন!'

…'কতো কোটি কল্পকালের পুণ্যি ছিলো, তাই এমন দর্শন হলো।' 'প্রাণভরে দেখতে দিচ্ছে না কিন্তু…তাঁবুর দরজাটা একবারটি তুলছে, আর ফেলে দিচ্ছে।'…'ভেতরে ঢুকতে দেয় না?'…'ভেতরে?—আর কিছু নয়?…ওই—ক্ষণিকের দর্শন।'

ঘোষালদের বাড়ীটা গ্রামের প্রান্তসীমায়। জয়চণ্ডীর মন্দিরে যাবার পথটা সোজা চলে গেছে এই ঘোষালবাড়ীর সামনে দিয়ে। এ অঞ্চল থেকে যারা যাচ্ছে, ঘোষাল বাড়ীর সামনে দিয়েই তাদের আনাগোনা। আরো একটা শর্টকাট্ আছে, সেটা হচ্ছে ঘোষালদের রান্নাঘরের পিছনের উঠোন দিয়ে। এই উঠোনটা পার হয়ে বনবাদাড় ভেঙে যেতে পারলে, বড়ো রাস্তার চাইতে অনেকটা আগে পৌঁছনো যায়। ছোট ছেলেপুলেদের গতিবিধি প্রায়শঃই এই দিক দিয়ে। কাঁটাবনকে তারা গ্রাহ্য করে না।

ঘোষাল-গিন্নী নিভাননী যদিও এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, এবং অনধিকার প্রবেশকারী দ্রুত ধাবমান বালকদলের উদ্দেশ্যে যা শাপ-শাপান্তর করছেন, তার যথার্থ কোনো শক্তি থাকলে ছেলেগুলো চণ্ডীতলা পর্যন্ত পৌঁছতো কিনা সন্দেহ। পরম ভাগ্য তাদের যে, কলিযুগে বাক্য শক্তিহীন।

আবার একা নিভাননীই নয়, তাঁর মেয়ে সুধামুখীও নিজ নামমহিমা বিস্মৃত হয়ে বিষ উদ্‌গীরণ কম করছে না। উঠোনে ঢোকবার বেড়ার দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে চৌদ্দবার, কিন্তু সে ব্যবস্থা স্থায়ী হচ্ছে না। ঘরেই যে তাদের ঘরভেদী বিভীষণ! সে বিভীষণ আর কেউ নয়, নিভাননীর ছেলের বৌ বাসন্তী! বন্ধ্যা বাসন্তীর কাছে ছেলেপুলের ভারী প্রশ্রয়। শাশুড়ী ননদ চোখের আড়াল হলেই বাসন্তী টুক্ করে দরজাটি খুলে দিচ্ছে। আর যদি কাউকে কায়দা করতে পারছে তো প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করছে তাকে। কেমন সেই

নারায়ণ, কি ভাবে তাঁর অবস্থান, কেমন করে করছেন মানুষের ভাগ্যলিপি পাঠ।

কিন্তু কেন?

চার গাঁয়ের লোক চণ্ডীতলায় ছুটছে, 'দর্শনে' ধন্য হচ্ছে, বাসন্তীই বা পরের মুখে ঝাল খেতে চায় কেন? এই—এইখানেই আসল কথা। দেশসুদ্ধ বৌ ঝির চণ্ডীতলায় যাওয়ার অনুমতি আছে, নেই কেবল বাসন্তীর। বাসন্তীর স্বামী শশধরের কড়া নিষেধ। যুক্তি অবশ্য তার বেশী নেই, শুধু গালের হাড় বার করা শীর্ণ মুখখানা বাঁকিয়ে বলেছে—রাম কহো, ওই বেহেড কাণ্ডর মধ্যে আবার মেয়েছেলে যায়?

যেন গ্রামের সমস্ত মহিলাকুল 'মেয়েছেলে' নয়।

স্ত্রী এবং ভগিনী দু'জনকেই সে কড়া নিষেধ করে দিয়েছে, কিন্তু ভগিনী সুধামুখী সে নিষেধের মর্য্যাদা যে আর রাখতে পারবে, এমন মনে হয় না। পথটা যে আবার তাদেরই বাড়ীর সামনে দিয়ে। সুধামুখীর চিত্ত উদ্বেল হয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে জনতার সঙ্গে সঙ্গে, দেহটা দাঁড়িয়ে আছে খোলা দরজার কপাট ধরে।

বাঁড়ুয্যে গিন্নী ফিরতি মুখে সুধামুখীকে এমতাবস্থায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে সস্মিত বচনে শুধালেন—দেখে এলি সুধা?

সুধা একটি মুখভঙ্গীর সাহায্যে জানিয়ে দিলো—না, সে সৌভাগ্য এখনো ঘটেনি তার।

বাঁড়ুয্যে গিন্নী শশধরের প্রকৃতি জানেন, বছর বছর অতো বড়ো যে মেলা হয় চণ্ডীতলায়, স্ত্রী ভগিনীর সেখানে যাওয়া তার বারণ, সেও অবিদিত নেই বাঁড়ুয্যে গিন্নীর। ভাঙা মেলায় লুকিয়ে চুরিয়ে সুধামুখী যদি বা যায়, বৌ বাসন্তী যে জন্মেও যায় না সবই তাঁর জানা। তবু চরম বিস্ময়ের অভিব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে বললেন—বলিস কি? এখনো যাসনি? তোদের দোর দিয়ে এই কাণ্ডর লোক উন্মাদ হয়ে ছুটছে,

আর তোরা স্থির হয়ে ঘরে বসে আছিস ? ধন্যি বটে ! বৌমাও যায়নি ?

সুধা অগ্রাহ্যসূচক একটা মুখভঙ্গী করে উত্তর দেয়—আমিই যেতে পেলাম না, তার আবার তোমার 'বৌমা' !

—হ্যাঁ লা এমন সুযোগ জীবনে আর হবে ?

সুধা বিরক্ত ভাবে বলে—কি আর বলবো জ্যেঠি, দাদার গোঁয়ার্তুমির জন্যেই আমাদের জন্মে কখনো কিছু হলো না। দেশ সুদ্ধু মেয়েমানুষ যাচ্ছে, আর আমরা গেলেই মহাভারত অশুদ্ধু হয়ে যাবে !

বাঁড়ুয্যে গিন্নী হতাশ নিশ্বাসের অভিনয় করে বলেন—কি আর বলবো মা ! তোমাদের বাড়ীর সবই অনাছিষ্টি। বলি—যাচ্ছে না আবার কে ? ঘরের কনেবউটি পর্য্যন্ত যাচ্ছে। তাদের মান মর্য্যেদা নেই ? যতো মান্যি শশধরের ?

স্বস্থানে প্রস্থান করবার মানসে বড়ো বড়ো করে পা চালাতে সুরু করেন বাঁড়ুয্যে গিন্নী।

ওঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সুধা আর ধৈর্য্য মানে না। তাড়াতাড়ি দরজা ছেড়ে দিয়ে তাঁর পিছু নিয়ে বলে—তুমি তো নিজের চক্ষে দেখে এলে জ্যেঠি ? কি রকম দেখলে ?

বাঁড়ুয্যে গিন্নী প্রায় বৈকুণ্ঠলোকের কাছাকাছিই দৃষ্টি তুলে গদগদ নিশ্বাস ফেলে বলেন—কী যে দেখলাম, তা আর এই পাপ মুখে কি বলবো মা ! অন্তর্য্যামীই জানছে ! তবে হ্যাঁ এও বলি সুধা, ভাইয়ের ভাতেই না হয় আছিস, তা বলে ভাইয়ের এতো শাসন মানবি কিসের দুঃখে ? মা এখনো বেঁচে তোর ! দাদা তো তোর পরকালের ভার নেবে না ? বরং ভবিষ্যতে ভাগ্যে কি আছে একবার জেনে আয় !

বিচলিত সুধা এবার সংকল্প স্থির করে ফেলে। উত্তেজিত রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—কতো কি লাগবে জ্যেঠি ?

—কিছু না ! সুধু একটা সুপুরি আর পাঁচটা পয়সা। তিনি কি আর পয়সার কাঙাল বাছা ?

সুধামুখী ফিরে এসে দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকে যায়।

ঘোষালদের অবস্থা মন্দ নয়। বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ বলা চলে। অন্দর মহলের দিকটা, যথা—রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, গোয়াল ঘর, ঢেঁকি ঘর ইত্যাদি মাটির তৈরি হলেও শোবার ঘরগুলো পাকা। খানতিনেক ঘর ও দালান মিলিয়ে রাস্তা থেকে বাড়ীটি বেশ জমকালোই দেখায়। অবশ্য বাসুলপুরের পক্ষে। এই রাস্তাই চলে গেছে দেবী চণ্ডীর মন্দির অভিমুখে।

সুধামুখীর মতোই বিষাদ-প্রতিমারূপে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে ছিলো বাসন্তী, তবে বাইরের দিকে নয়। রান্নাঘরের পিছনের দাওয়ায়। এখান থেকে নামলেই একটা পথ গেছে তাদেরই খিড়কির পুকুরের দিকে, আর একটা পথ নীচু একটা দরজার সীমান্ত থেকে খানিক দূর গিয়ে কাঁটাবনে পথ হারিয়েছে। সেই হারানো পথই বালকবৃন্দের পথ।

বসে থাকতে থাকতে বাসন্তীর কানে এসে পৌঁছলো একাধিক বালক কণ্ঠের সশব্দ ফিস্‌ফিস্‌ ধ্বনি।

—এই সেরেছে, দোর বন্ধ।

—বুড়িটা কী শয়তান রে, দিয়েছে বন্ধ করে।

—পাঁচীল টপকাতে পারবি ?

—দূর, দেখে ফেলবে। চ' বড়ো রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাই।

বাসন্তীর ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে দেরী হয় না। ও আস্তে আস্তে উঠে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিঃশব্দে কপাটের হুড়কোটা খুলে দেয়। শুধু খুলেই দেয় না খপ্‌ করে একটা ছেলের হাত ধরে ফেলে চুপি চুপি বলে—কি রে কেষ্ট, আবার যাচ্ছিস নাকি ?

কেষ্ট হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে ফিক্‌ করে হেসে ফেলে বলে—চুপ চুপ কাকীমা, তোমার ওই ডাইনীবুড়ি শাশুড়ীটি শুনতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না। ছাড়ো যাই।

বাসন্তী কিন্তু ছাড়ে না, তেমনি ভাবেই আটকে রেখে বলে—দাঁড়া না। বলছি কাল তো দেখে এলি, আবার আজ যাচ্ছিস যে?

কেষ্ট যেন দপ্ করে নিভে যায়। ম্লান ভাবে বলে—দেখলাম আবার কোথা? আমি, গোপাল, উমাপদ, আমরা কেউই দেখিনি।

বাসন্তী তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে—সে কিরে, কেন? যা দেখতে গেলি তাই দেখলি না?

—দেখবো কোথ্থেকে? পয়সা লাগে না বুঝি?

বাসন্তী অবাক ভাবে বলে—ওমা কী বোকা ছেলে রে তুই! সামান্য পাঁচটা পয়সা খরচের ভয়ে জলজ্যান্ত নারায়ণ দর্শন করবি না?

—পাঁচটা পয়সা? পাঁচটা পয়সাই বা দিচ্ছে কে?···কেষ্ট একটি উচ্চাঙ্গের চাল চালে, মুখখানি যতোটা সম্ভব করুণ করে বলে—বাবা কি পয়সা দেয়? একটা পয়সা চাইলে বলে—'মেরে পিঠের ছাল তুলবো।'

—বাবা তো বলবেই। বেটা ছেলে যে। বাসন্তী পুরুষ জাতির হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে নিশ্চিত, কিন্তু নারীজাতির প্রতি বোধ করি কিছু আস্থা পোষণ করে। তাই উদ্‌গ্রীব সুরে বলে—কিন্তু তোর মা? মা দেয় না পয়সা?

কেষ্ট একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে—মা? হুঁঃ মা নইলে আর পয়সা দেবে কে? মা নিজেই একেবারে রাজা কি না। বাবা কি মাকেই দেয় না কি?

বাসন্তী ব্যগ্রভাবে বলে—আচ্ছা আমি তোদের পয়সা দেবো, তোরা দেখে এসে কী দেখলি আমায় ঠিক ঠিক বলে যাবি?

কেষ্ট এবং তার সঙ্গী যুগল আকর্ণ হাস্যে বলে—নিয্যস্ বলবো। ঠিক বলবো।···দাও তা' হলে?

বাসন্তী তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে একটা আধুলি নিয়ে দলপতি কেষ্টর হাতে দিয়ে বলে—এই আধুলিটা নে, তিন জনে দেখবি বুঝলি? এক পয়সার সুপুরি কিনে নিস্।

কেষ্ট পরম স্নেহভরে আধুলিটি মুঠোয় চেপে ফেলে এক গাল হেসে বলে—বাকী পয়সা ফিরে এসে ঘুরিয়ে দিয়ে যাবো।

বাসন্তী হেসে ফেলে। কেষ্টর মাথাটা নেড়ে দিয়ে সস্নেহে বলে —থাক্ থাক্, খুব গোছালো ছেলে হয়েছিস। বাকী পয়সা আর ঘুরিয়ে দিয়ে যেতে হবে না, ওতে তোরা ফুলুরি কিনে খাস্।

বিস্ময় আনন্দ আর শ্রদ্ধার সংমিশ্রনে গঠিত একটি অপূর্ব দ্যুতি খেলে যায় তিনটি গ্রাম্যবালকের মুখের ছবিতে। ঘোষাল কাকীমা ভালো বটে, কিন্তু এতোটা ভালো!

ছেলে তিনটি বোধ করি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজছিলো, হঠাৎ কোনো কিছু না বলে চোঁ চাঁ দৌড় দিলো। বলা বাহুল্য, বাসন্তী এতে বিস্ময় বোধ করে না। কারণ ওদের ওই দৌড় মারার কারণটা বাসন্তীর অনুমানের বাইরে নয়। ও বুঝেছে পিছন থেকে ঘটনাস্থলে আবির্ভাব ঘটেছে নিভাননীর! অনুমান করে বাসন্তী তাড়াতাড়ি মুখের চেহারায় একটি নিস্পৃহ নির্লিপ্ত ভাব এনে ফেলে।

নিভাননী এদিক ওদিক তাকিয়ে মুখাকৃতি বিকৃত করে প্রশ্ন করেন—ছোঁড়া তিনটে অমন করে দৌড় মারলো যে বৌমা? ব্যাপারটা কি?

বাসন্তী ব্যাপারটাকে লঘু করে বলে—ব্যাপার আবার কি মা? ছেলেপুলের হাঁটনই দৌড়! হঠাৎ কি খেয়াল হলো, ছুট মারলো।

নিভাননী জলদগম্ভীর স্বরে বলে ওঠেন—শাক দিয়ে মাছ ঢেকে জগৎকে বোঝাওগে বৌমা, নিভা ঘোষালনিকে বোঝাতে এসো না। নিশ্চয় কিছু একটা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। দেখলাম, কেষ্ট কি যেন মুঠো করে নিয়ে ছুটলো।

বাসন্তী নিতান্ত সরল মুখে বলে—এই দেখুন কাণ্ড! নিয়ে আবার কি যাবে? আমি একটা মানুষ জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে, নিলেই হলো?

—তুমি? নিভাননী এক ঝটকায় মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—তোমার ব্যাখ্যানা তুমি আর নিজের মুখে কোরো না বৌমা, সেই যে বলে না 'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা' তুমি সেই তাই। বলি দরজা খুলে দিলো কে?

কথার মাঝখানে সুধামুখী এসে দাঁড়ালো।

বাঁড়ুয্যে জ্যেঠির সঙ্গে কথোপকথনান্তে যে উত্তেজিত মূর্তি দেখা গিয়েছিলো, সেই উত্তেজনার আভা তার মুখে।

—মা, শুনলে বাঁড়ুয্যে জ্যেঠির কথা?

নিভাননী সচকিতে বলেন—কি কথা?

—নর নারায়ণের কথা? কি আর বলবো মা! নাস্তিক ছেলের সঙ্গে মিশে মিশে তুমি সুদ্ধু নাস্তিক হয়ে যাচ্ছো! নইলে রাজ্যি ঝেঁটিয়ে লোক যাচ্ছে নরজন্ম সার্থক করতে, আর আমাদের বাড়ীতে কিবা রাত্র, কিবা দিন।

নিভাননী দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলেন—শশধর যে বলছিলো—ও সব না কি সাজানো জিনিষ, কেবল পয়সা আদায়ের ফন্দী!

—দাদা কাকে কি না বলে? গো ব্রাহ্মণে কানা কড়ার ভক্তি আছে দাদার? গুরুপুরুতকে পর্য্যন্ত তাচ্ছিল্য করে বলে 'বাম্না'। দাদার কথা শুনে চলতে হবে? বাঁড়ুয্যে জ্যেঠি নিজে দেখে এসেছেন —শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ! ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিচ্ছেন!

নিভাননী ফের সন্দেহযুক্ত স্বরে বলেন—শঙ্খচক্রগদাপদ্ম নাকি তারা হাতে ধরিয়ে দিয়েছে বলছে—

সুধামুখী অসহিষ্ণু স্বরে বলে—তোমার যদি অতো সন্দেহ থাকে যেও না, মোট কথা আমি বাবা যাচ্ছি।

সুধামুখীও যাচ্ছে।

বাসন্তীর চিত্ত যেন হাহাকার করে ওঠে। শশধরের মতো নাস্তিক সে নয়, তা ছাড়া অবিরত পথচারী যাত্রীদের দেখতে দেখতে

বিশ্বাসের মূল তার ক্রমশঃই দৃঢ় হচ্ছে। সেই দুর্লভ বস্তু দর্শনে যেতে না পাওয়ার পরম দুঃখের মধ্যে কিছু সান্ত্বনা ছিলো. সুধামুখীও তার দলে। কিন্তু সে সান্ত্বনাও যেতে বসলো।

শাশুড়ী ননদের সামনে সহজে সে মান খোয়ায় না। কিন্তু এখন আর স্থির থাকতে পারে না। ব্যগ্রস্বরে বলে—বাঁড়ুয্যে জ্যেঠি কি বললেন ঠাকুরঝি? ভূত ভবিষ্যৎ সব জেনে এসেছেন?

—সে আবার বলতে? এমন সুযোগ আর হবে? একটি সুপুরি আর পাঁচটি পয়সা, ব্যস। পূবমুখী দাঁড়িয়ে তিনটি প্রশ্ন করবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভেতর থেকে উত্তুর এসে যাবে।

বাসন্তী ঈষৎ বিস্মিত স্বরে বলে—তিনটির বেশী কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না?

—যাবে না কেন? সুধামুখী সবজান্তার ভঙ্গীতে বলে—পয়সা থাকে এক কোটি কথা শুধোও। এক বারে তিনটি কথা। নারায়ণ তো আর খোকা নয়, যে ভুলিয়ে ভালিয়ে এক টিকিটে দশ কথা আদায় করে নেবে?...মা আমি কিন্তু চললাম। দাও দিকিনি আনা দুই পয়সা।

নিভাননী ব্যাজার মুখে বললেন—পয়সা বললেই পয়সা? আমি কোথায় পাবো বাছা, আমার কাছে নেই। শশধর বাড়ী আসুক—

সুধামুখী দাওয়ায় বসে পড়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—দাদা এলে তবে তুমি আমাকে দু' আনা পয়সা দেবে, এই আষাঢ়ে গল্প বলতে বসলে মা? দু' গণ্ডা পয়সা তোমার কাছে নেই?

—থাকবে কোথা থেকে বাছা? চব্বিশ ঘণ্টাই তো অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ছে। তোমাদের বায়না মেটাতে মেটাতেই ফতুর হয়ে গেলাম আমি! এই তো তোমার ব্যাটা আব্দার করে দু' আনা পয়সা নিয়ে গেলো।

—কে বাদলা? সুধামুখী ঝঙ্কার দিয়ে বলে—দিদিমা তুমি দু' আনা পয়সা নাতিকে দিয়েছো, সেই খোঁটা দিচ্ছো? গলায় দড়ি

আমার, ভাই তোমাদের হাত তোলায় পড়ে আছি। আর তাও বলি—'পারবো না' বললে চলবে কেন? অমনিষ্যির হাতে মেয়ে দিয়েছো, সে কর্ম্মফল ভুগতেই হবে।

বাসন্তী এতোক্ষণ আকাশ পানে চেয়ে বোধকরি ভূত ভবিষ্যতের স্বপ্নেই বিভোর ছিলো, মাতা কন্যার মধুরালাপে বর্ত্তমানে ফিরে এসে ব্যস্ত হয়ে আঁচলের গিঁঠ খুলতে খুলতে বলে—এই যে নাও না ঠাকুরঝি, রয়েছে তো—

সুধামুখী যেন বাসন্তীকে কৃপা করছে এই ভাবে হাতখানা পেতে বলে—দাও!···সাধে কি আর শাস্তরে বলেছে, ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত!

পয়সা হাতে পেয়ে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ায় না সুধামুখী, লম্বা লম্বা পা ফেলে চণ্ডীতলার উদ্দেশে যাত্রা করে।

নিভাননী গজ গজ করতে থাকেন—আমার নাকের সামনে মট্‌ করে আঁচল খুলে পয়সা ছড়ানো! গুরুজনের একটা মানমর্য্যাদা নেই গা? হবে না কেন, শশধর যে আস্কারা দিচ্ছে। গর্ভধারিনী মা গেলো তলিয়ে, বৌর আঁচলে পয়সা! ঘোর কলি! ঘোর কলি!

নিভাননী কলি বর্ণনায় যতোই পঞ্চমুখ হয়ে উঠুন, বাসন্তীর কানে আর কিছুই ঢোকে না। সমস্ত চিত্ত আকুল হয়ে ওঠে ওর একটি মাত্র প্রশ্নে।

ভবিষ্যৎ?

কী সেই ভবিষ্যৎ?

বাসন্তীর চোখে যা কেবল একটা নীরেট দেওয়াল মাত্র। যার কোথাও এমন কোনো বিদারণ-রেখা নেই, যেখান দিয়ে একটু আলো উঁকি দিতে পারে। এর থেকে কি উদ্ধার আছে তার? এই অন্ধকার ভেদ করে কোনো দিন ফুটবে আলোর আভাস?

এতো পরিস্কার করে ভাবতে পারে না বাসন্তী, শুধু বোধহীন একটা নিরুপায় ব্যাকুলতা মনের মধ্যে পাক খেতে থাকে।

ভারী হাসিখুসি স্বভাবের মেয়ে ছিলো বাসন্তী বিয়ের আগে। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সব কিছুর উপরই ছিলো তার ষোলো আনা আকর্ষণ। সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে সে উজ্জ্বল রাখতো, মাতিয়ে রাখতো।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ী বড়ো শক্ত ঠাঁই। বাসন্তীকে বাসন্তীর শাশুড়ী ননদ আর স্বামী এই তিনজনে মিলে প্রায় টিট্ করে এনেছে বলা চলে।

মেয়ে মানুষের পক্ষে কোন্ আচরণ সঙ্গত, আর কোন্ আচরণ অসঙ্গত, তার হাজারো ফিরিস্তি নিভাননীর মুখস্থ। উঠতে বসতে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে এসেছেন তিনি এযাবৎকাল। এখনো করেন। আবার—কেবল মাত্র ঈর্ষার বিষে মানুষকে কতোটা দগ্ধ করা যায়, তার উদাহরণ দেখাচ্ছে সুধামুখী! নাম মাহাত্ম্যে সে প্রায় পদ্মলোচনেরই সমগোত্র।

এ ছাড়া শশধর।

লোক হিসেবে শশধর যে খুব একটা খারাপ কিছু, তা নয়। 'কটুভাষী' ছাড়া অন্য কোনো নিন্দে তার নেই পাড়ায়। স্বামী হিসেবেও অত্যাচারী নিপীড়ক বা পাষণ্ড বদমাইস বলা চলে না। কিন্তু একটি দোষেই বাসন্তীর জীবন দুঃখময় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে সে। আর কিছু নয়—লোকটা স্ত্রীর সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন।

উদাসীন স্বামী তো দুঃখদায়ক, কিন্তু অতিসচেতন স্বামী? যে স্বামী স্ত্রীটিকে সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখতে চায়? যে স্বামী সব বিষয়ে স্নেহশীল হয়েও অকারণ সন্দেহে উগ্র হয়ে ওঠে?

হয়তো বা এই উৎকট সুখের চাইতে মর্মান্তিক দুঃখ কমই আছে।

কিন্তু দোষ কাউকেই দেওয়া যায় না।

নিভাননী তাঁর আজন্মসঞ্চিত কুশিক্ষা আর অশিক্ষায় এইটাই ভাবতে অভ্যস্ত—ছেলের বৌকে টিট্ করে রাখাটা শাশুড়ী জাতির একান্ত কর্ত্তব্য। সুধামুখীর কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তার প্রাণেই বা ঈর্ষা ছাড়া উদারতার হাওয়া বইবে কোন্ আকাশ থেকে?

পৃথিবীকে সোনার চোখে দেখবার চোখ সে পেলো কোথায়? যে মেয়েকে নিরুপায় হয়ে স্বামীপুত্র নিয়ে পিতৃগৃহে বাস করতে হয়, পৃথিবী তার কাছে তিক্তরসের ভাণ্ডমাত্র।

এ ছাড়া শশধর।

খুঁজলে শশধরেরও মনস্তত্ত্বের হদিস পাওয়া যায় বৈ কি। বাসন্তীকে সে বিয়ে করেছে বটে, এবং গরীবের মেয়ে বাসন্তী বিয়ে হয়ে ইস্তক এখানেই পড়ে থেকে তার সংসারের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কিছুর বোঝা বয়েও চলেছে, কিন্তু শশধরের মনের মধ্যে কোথায় যেন আছে নিজের সম্বন্ধে একটা অযোগ্যতা বোধ।

হয় তো এ বোধের জন্য বাসন্তীর অনুপম রূপই দায়ী।

আর একটি ব্যক্তি এ সংসারে আছে, সে হচ্ছে সুধামুখীর স্বামী গৌরাঙ্গ। 'বাউণ্ডুলে' শব্দটার যদি কোনো প্রতীক খাড়া করার দরকার হয়, তা' হলে অনায়াসেই গৌরাঙ্গকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। লেখাপড়ার বালাই তার কোনো কালে ছিলো কি না বলা শক্ত, কাজকর্ম্মেরও বালাই নেই। নিভাননী যে একমাত্র মেয়েকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সে বোধ করি কেবলমাত্র ভাবী জামাতার রূপে বিগলিত হয়ে। হ্যাঁ, নামটা তার সার্থক। নামকরণের বেলায় কারো পরিহাস-প্রবৃত্তি জেগে ওঠেনি বলা চলে।

তবে আপাততঃ নিভাননী রূপবান জামাতাকে 'রাঙা মুলো' বলে অভিহিত করেন। অবশ্য খুব অন্যায়ও করেন না। কারণ যে ব্যক্তি রোজগার করে না, এবং করতে না পারার জন্যে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না, দিনরাত সুর ভাঁজে, সুযোগ পেলেই তবলা পিটোয়, অকারণেই সর্বদা আনন্দের সাগরে ভাসে, তাকে ও ছাড়া আর কিই বা বলা যায়?

অদ্ভুত ছেলে এই গৌরাঙ্গ।

যদিও ঘরজামাই হিসেবে সে এ সংসারের স্থায়ী বাসিন্দার

পর্য্যায়ে পড়ে, তবু তার স্থায়িত্বটা অনিশ্চিত। মাঝে মাঝে থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ ডুব দেয়। কোথায় যায়, কেন যায়, তার পাত্তা পাওয়া যায় না। বাড়া ভাত নিয়ে বসে থাকতে থাকতে তল্লাস পড়ে। পাড়ার সর্বত্র খুঁজে আসেন নিভাননী। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে ওর যে একটা সখের যাত্রা পার্টির আখড়া আছে, সেখানেও উঁকি মারতে ছাড়েন না, এবং গৌরাঙ্গকে না পেয়ে তার দলের ছেলেদেরই গালমন্দ করে আসেন।

শশধর অবশ্য খুঁজতে যায় না, কারণ যেই ডুব মারে গৌরাঙ্গ, শশধর বলে—'ওর মরণের খবর পেলে আমি হরির লুট দেবো।'

সুধামুখী স্বামীর ভাবনায় কাঁদে কাটে, ভাইয়ের উপর অভিমান করে, এমন হতভাগার হাতে ধরে দেওয়ার জন্যে মাকে গঞ্জনা দেয়, আর পাড়া বেড়িয়ে বেড়ায়।

বারে বারে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন সকলেই জানে গৌরাঙ্গ দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর হঠাৎ কোন দিন অসময়ে এসে উদয় হয়ে 'ভীষণ খিদে পেয়েছে' বলে, হয়তো মুগের ডাল ভাতে দিয়ে ভাত চড়াবার ফরমাস জানাবে।

তখন অবশ্য বিরহিনী সুধা স্বামীর জন্য ভাতের বদলে আর যে জিনিষের ব্যবস্থা করতে চায়, সেটা হিন্দু নারীর ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খায় না। রান্নাঘরের ভার বাসন্তীর হাতে তাই রক্ষা।

এই চঞ্চলপ্রকৃতি বাউণ্ডুলে লোকটার প্রতি কেন যে বাসন্তীর একটা সস্নেহ প্রশ্রয় আছে কে জানে। হয় তো দু'জনের প্রকৃতিতে কোথাও কোনো খানে আছে একটুখানি মিল। বয়সে অবশ্য গৌরাঙ্গ বাসন্তীর চাইতে কোন না চার পাঁচ বছরের বড়ো, তবু বাসন্তীর মনে হয় ও যেন একটি বড়ো মাপের শিশু।

সুধামুখীরও অবশ্য তাই মনে হয়, তবে সে তার মনের কথা ব্যক্ত করতে দ্বিধা বোধ করে না, সচীৎকারে সরল ভাষ্যে বলে 'বুড়ো

খোকা।' গৌরাঙ্গ কিন্তু রাগে না, উল্টে বৌকে আরো জ্বালায়।

তারও বাসন্তীর প্রতি বিশেষ এমন একটা সশ্রদ্ধ প্রীতি আছে যা সহজেই চোখে পড়ে, এবং সেটা নিভাননী এবং সুধামুখীকে উত্তপ্ত করতে সাহায্য করে।

বর্তমানে গৌরাঙ্গর অনুপস্থিতির কাল চলছিলো। যদিও এটা তার স্বভাবগত, তবু ভাবনা একটু না হয়ে পারে না। সুধামুখীরও তাই মনে সুখমাত্র নেই। এদিকে আজ দশ দিন স্বামী বাড়ী নেই, ওদিকে নর নারায়ণ। গৌরাঙ্গর ভাগ্যে নারায়ণ দর্শন ফস্কে যাবে, এটাও তো প্রাণ ধরে সইতে পারছে না সুধামুখী।

শশধরের সেরেস্তার কাজ, সকালে একবার কাজে বেরোয়, দুপুরবেলা বাড়ী ফিরে স্নানাহার ও কিয়ৎ পরিমাণ দিবানিদ্রা সেরে বিকেল নাগাদ আর একবার বেরোয়।

আজ সকালে বেরোবার সময় সাহসে ভর করে বাসন্তী একবার কথাটা পেড়েছিলো তার কাছে।

—হ্যাঁ গো আজ দশদিন হয়ে গেলো, ঠাকুর জামাই তো কই এলো না?

দালানে পাতা সেকেলে আমলের 'ছ'পেয়ে' তক্তপোষটার উপর বসে, শশধর তখন জলযোগান্তে জুৎকরে একটি পান গালে দিয়ে দোক্তার কৌটো খুলছিলো, বাসন্তীর কথায় ভুরু কুঁচকে বললো—কি হয়েছে?

বাসন্তী শশধরের হাত মোছা ভিজে গামছাখানা ঝেড়ে পাট করে উঠোনের দড়িতে মেলে দিতে দিতে ভ্রুভঙ্গী করে বলে—হয়েছে আবার কি! বলছি—ঠাকুর জামাইয়ের একটা খোঁজ করবে না?

শশধর স্ত্রীর মুখের দিকে একটি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে—কেন, ঠাকুর জামাইয়ের জন্যে বড্ডো মন কেমন করছে বুঝি?

'ঠাকুর জামাই' শব্দটার উপর অযথা একটু জোর দিতে ভোলে না শশধর।

বাসন্তী কিন্তু এ কটাক্ষ গায়ে মাখে না। বোধ করি এটা তার গা সওয়া জিনিষ বলেই। স্বামীর কথার পিঠে গম্ভীর ভাবে বলে—করবে না কেন? মন থাকলেই, সেটা সময় অসময় 'কেমন' করে।

—তা হলে বরং সেই জিনিষটাকেই ছাঁটতে চেষ্টা করো। বলে কোঁচা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছাতাটা নেবার জন্যে দেয়ালের কোণের দিকে হাত বাড়ায় শশধর।

বাসন্তী খপ করে ছাতাটা হস্তগত করে বলে—হচ্ছে, এক মিনিট সবুর করো না। আচ্ছা—এও বলি, ঠাকুরঝি তো তোমার মায়ের পেটের বোন, তার মুখ চেয়েও তো লোকটাকে একটু খুঁজতে হয়?

শশধর ছাতাটা টেনে নিয়ে বগলে চেপে উঠোনে নামতে নামতে বলে—'ঠাকুরঝি' তোমার মতো তার জন্যে মন কেমন করে মরে যাচ্ছে না।

—না যাচ্ছে না! তুমি জানো।

—না জানবার আছে কি? চোখে দেখতে পাই না? হু'টোতে সম্পর্ক তো সাপে নেউলে!

বাসন্তী গমনোদ্যত স্বামীর পিছন পিছন এগিয়ে এসে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বলে—যা ভাবো, তা নয় মশাই! ভালোবাসার তুমি জানো কিছু?

—জানবো না কেন? স্বামীকে ডিঙিয়ে পরপুরুষের ওপর দরদকে বলে 'ভালোবাসা'—বলে এক ঝট্‌কান মেরে ঘুরে বেড়ার দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে চলে গিয়েছিলো শশধর।

তারপর তো সুধামুখী গেছে চতুর্ভুজ দর্শনে! নিভাননী বেরো-লেন পাড়া টহল দিতে। বাসন্তী রান্নাবান্না সেরে 'নেই কাজ তো খই ভাজ্' হিসেবে একটা ভাঙা খুন্তি নিয়ে উঠোনের ধারে ধারে

লাগানো গাঁদা আর দোপাটি গাছগুলোর গোড়া খুঁড়তে বসে। এই ছোট্ট বাগানটি বাসন্তীর বিশেষ প্রিয়, সারাদিনে সংসারের সহস্র কাজের মধ্যেও এর যত্ন করতে ভোলে না।

মাথা নীচু করে আপন মনে কাজ করে চলেছে বাসন্তী, ইত্যবসরে বেড়ার দরজা ঠেলে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে।

গায়ে একটা হাফ্‌সার্ট, কিন্তু ধুতির কোঁচাটি দিব্যি লম্বা। সুশ্রী সুকান্তি চেহারা, চুলের বাহারটিও খাসা। কাঁধের উপর একটা ভাঙা ঝরঝরে বক্স হারমোনিয়ম, ডান হাতে একটা দড়ি বাঁধা মাছ।

ইনিই শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ বাবু।

দশদিন অনুপস্থিতির পর এই নাটকীয় আবির্ভাব তার।

বেড়ার শব্দেই ঘাড় ফিরিয়েছিলো বাসন্তী, গৌরাঙ্গকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে কলহাস্যে সম্বর্ধনা করে ওঠে—ওমা ঠাকুর জামাই যে! আমি ভাবছি সুধাই এলো বুঝি। এতোদিনে আসা হলো বাবুর? থেকে থেকে কোথায় ডুব মারা হয়? মাছ কোথায় পেলে? ধরেছো না কি?

গৌরাঙ্গ বাঁ হাত দিয়ে হারমোনিয়মটাকে ধরে কৌশলে কাঁধটা নীচু করে সেটাকে দাওয়ার ধারে নামিয়ে রেখে বলে—ওরে ব্যস! একেবারে এক কুড়ি প্রশ্ন! হচ্ছে একে একে! তারপর বাড়ীটা এমন নিস্তব্ধ দেখাচ্ছে কেন? শাশুড়ী ঠাকরুণ বুঝি বাড়ী নেই?

বাসন্তী হেসে ফেলে বেড়ার দরজার দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলে—সর্বনাশ! একখুনি আসবেন! কিন্তু বললে না তো এতোদিন উধাও হয়ে ছিলে কোথায়?

—'ছিলে কোথায়'!···সহসা কোন্ ফাঁকে নিভাননী একেবারে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। দুই কোমরে হাত দিয়ে বাগিয়ে দাঁড়িয়ে বৌয়ের সুর নকল করে বলেন—'ছিলে কোথায়'? বড্ডো যেন নতুন ঘটনা! না বলে কয়ে উধাও হয়ে যাওয়া ঠাকুর জামাইয়ের এই প্রথম কেমন? শালার সংসারে বেওয়ারিশ ভাত

আছে, আর শালাজের আস্কারা আছে, ভাবনাটা কি ?···বল্লি গৌরাঙ্গ. এতোদিন পরে এই অবেলায় মাছ হাতে করে ঢুকতে তোমার লজ্জা করলো না বাছা ?

গৌরাঙ্গ মাছটাকে সামনেই দড়ি ধরে দোলাচ্ছিলো, শ্বাশুড়ীর কথায় দোলানো থামিয়ে, মাছটার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে—লজ্জা ? কই না তো ?

উত্তর শুনে বাসন্তী ফিক্ করে হেসে ফেলে, কিন্তু নিভাননীর মুখ আরো ভীষণাকৃতি হয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধস্বরে বলেন—তা' বলবে বৈ কি বাছা, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছো। কিন্তু গেরস্থর তেল এতো সস্তা নয় যে, মাছ দেখে আহ্লাদে গলে যাবে। মাছ তুমি নিয়ে যাও। যাকে প্রাণ চায় বিলিয়ে দাও গে।

এ কথার উত্তরে গৌরাঙ্গ মাছটা উঁচু করে তুলে প্রায় শ্বাশুড়ীর নাক বরাবর প্রবল ভাবে আন্দোলিত করে বলে—কী যে বলেন ? এমন ফার্ষ্ট ক্লাশ মাছটা বিলিয়ে দেবো ? বার করুন বৌদি, আঁশবঁটিটা বার করুন।

বাসন্তী কৌতুক হাস্যে ভ্রুভঙ্গী করে চাপা গলায় বলে—আঁশবঁটি দিয়ে তোমার নাক কাটা হবে।···বলে বোধকরি বঁটি আনতেই উঠোনের ওপাশে অগ্রসর হয়।

চাপা গলার কথাটা নিভাননীর কান এড়ায়, কিন্তু পরিহাস উচ্ছল ভঙ্গীটি চোখ এড়ায় না। কুটিল দৃষ্টিতে একবার বধুর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে এসে তর্জ্জনী তুলে বলেন—খবরদার বৌমা, বলে দিচ্ছি তোমাকে, ও মাছে তুমি হাত দিতে পাবে না। বিলিয়ে না দেয়, শ্যাল কুকুরে খাক। দশদিন পরে বাড়ী ঢুকলেন বাবু মাছের ঘুস নিয়ে। আর তুমি যাচ্ছো তাইতে আস্কারা দিতে।···এই আমার মাথার দিব্যি, যদি তুমি ও মাছে হাত দাও !

বাসন্তী সরে এসে হতাশ সুরে গালে হাত দিয়ে বলে— একেবারে

মাথার দিব্যি দিয়ে বসলেন মা? রাগলে আপনার জ্ঞান থাকে না। এয়োস্ত্রী মানুষের বাড়ীতে মাছকে হেনস্থা করতে আছে?

মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেছে বাসন্তী।

সুধামুখী আর বাসন্তী দুটি এয়ো সংসারে। কার অলক্ষণ করবেন নিভাননী? জামাইয়ের ওপর রুচিছেদ্দা নেই বটে, কিন্তু তার দৌলতেই যে নিজের মেয়ের খাওয়া পরা! এদিকে চক্ষুশূল বৌটার দপ্‌দপানি একটু কমলে চোখ জুড়োতো, কিন্তু সেখানে প্রশ্ন ছেলে শশধরের।

অগত্যাই ভিতরে একটু নরম হয়ে পড়েন নিভাননী। কিন্তু মুখে সেটা স্বীকার করতে রাজী হন না, বেজার মুখে বলেন—জানোই তো বাছা, রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু দিব্যি যখন দিয়েছি, চন্দ্র সুর্যি এলেও রদ হবে না। তবে যদি শাশুড়ীকে অগ্যেরাহ্যি করে দিব্যি না মানো, আলাদা কথা।···তারা ব্রহ্মময়ী মা! মা গো জয়চণ্ডী, এতো লোককে নিচ্ছিস, আমায় কবে নিবি মা?

বৈরাগ্যের চরম অভিব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে নিভাননী রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেন।

গৌরাঙ্গ মাছটা উঠোনে ফেলে হতাশ ভঙ্গীতে একবার দুই হাত উল্টে কোমরে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই সহসা হাত নামিয়ে কোঁচার খুঁটটা কোমরে জড়াতে জড়াতে বলে—মা জননীর আমার নিজের ভোগে লাগবে না কি না, তাই মাছে হেনস্থা! কুছ পরোয়া নেই, আমিই বেটার সদগতি করে দিচ্ছি। আপনাকেই দিব্যি দিয়েছে, আমাকে তো লাগেনি? দিন দিকিন অস্তরখানা।

বাসন্তী হাত তুলে নিবৃত্ত করার ভঙ্গীতে বলে—থাক্ ঠাকুর জামাই, আর লোক হাসাতে হবে না। বেটা ছেলে আবার মাছ কুটবে!···হেসে ওঠে সে।

গৌরাঙ্গ বীরদর্পে বলে—কেন, পারবো না না কি? বলি—

আপনাদের ঘরসংসারের কাজের কোন্‌টা বেটাছেলের না পারে? মেয়েছেলে কাজের বড়াই করতে ভালোবাসে, তাই আমরা বোকা সেজে থাকি।···দিন দিকিন অন্তরখানা, এমন বাগিয়ে কুটবো যে, আপনার তাক্ লেগে যাবে।

—হয়েছে মশাই হয়েছে, ঠাকুরঝি এসে ওর সদগতি করবে, বড়াই কেউ করছে না। তুমি এমনিতেই যা তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছো রাতদিন, তাতেই রক্ষে নেই—

গৌরাঙ্গ অতঃপর কোঁচার খুঁট কোমর থেকে খুলে জুৎ করে রোয়াকের ধারে বসে। বাসন্তী মাছটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে রেখে আসে।

গৌরাঙ্গ হারমোনিয়মটাকে কোঁচা দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে সহাস্তে বলে—তবে থাক্! বরং স্থির হয়ে বসে একটু গান শুনুন।

সর্বনাশ!

এই ভর দুপুরে একা বাড়ীতে গৌরাঙ্গর কাছে বসে গান শুনবে বাসন্তী? আর এইটি হলো ঠিক শশধরের ফেরবার সময়! প্রায় অজ্ঞাতসারেই সভয়ে একবার বেড়ার দরজার দিকে তাকিয়ে বাসন্তী বলে—ওই ভাঙা বাজনা বাজিয়ে গান?

—ভাঙা মানে? গৌরাঙ্গ সচকিত হয়ে বলে ওঠে—এই বাজনা-টার জন্যেই আজ দশদিন গোবর্দ্ধন অধিকারীর কাছে হত্যে দিচ্ছিলাম। বুঝলেন? সে ব্যাটা 'দেবে' বলে ঝুলিয়ে রেখে না হক কদিন ভুগিয়ে মারলো। সহজে দিতে চায়? শেষ পর্য্যন্ত রফার থেকে দু'টাকা বেশী দিয়ে তবে বাগাতে পারি। দেখতে ভাঙা, কিন্তু জিনিষটা বনেদী, বুঝলেন বৌদি?···ছটফট্ করছেন কেন? বসুন না জুৎ করে! শুনুন।

বাসন্তী যে কেন ছট্‌ফট্ করছে, সে কথা বোঝবার বুদ্ধি কি আর গৌরাঙ্গর আছে?

অথচ এই অবোধ মানুষটাকে সে কথা বুঝিয়ে দেবার মতো রূঢ়তা

বাসন্তীর দ্বারা সম্ভব নয়।···কেমন করে সে বোঝাবে, এই সরল মানুষটার তুচ্ছ এই অনুরোধটুকুও রাখা তার পক্ষে কতো কঠিন। সেই নিরুপায়তার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে বাসন্তীর চোখে মুখে, ফুটে ওঠে হাত পায়ের চাঞ্চল্যে। অকারণে দড়িতে মেলে দেওয়া শশধরের গামছাখানা টেনে আনলায় রাখতে রাখতে বাসন্তী বেশ গলা বড়ো করে বলে ওঠে—শোনো কথা! পাগল না ক্ষ্যাপা! এখন বলে ছিষ্টির কাজ পড়ে, এখন জুৎ করে বসবো গান শুনতে?

—ছিষ্টির কাজ!

গৌরাঙ্গ অম্লান বদনে বলে—আপনাদের ছিষ্টির কাজ মানে তো গুষ্টির ভাত সেদ্ধ করা? হুঁঃ।

বাসন্তী একবার মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করে রাগের ভানে মুখ ভারী করে বলে—তা' সেটাই কি ফেল্না না কি? মেয়েমানুষের কাজ মেয়েমানুষে করবে, তা'তে লজ্জার কি আছে? লজ্জা বরং তোমারই হওয়া উচিত ঠাকুরজামাই! কাজ নেই কর্ম্ম নেই—

গৌরাঙ্গ ভাঙা বাজনাটার ওপর বেপরোয়া একটা চাপড় মেরে বলে—এই হয়েছে! শ্বাশুড়ী ননদের সঙ্গে মিশে মিশে তাদের গুণ বর্ত্তেছে। 'কাজ নেই কর্ম্ম নেই'! আপনার কর্ত্তার মতো সেরেস্তার খাতায় পেন্ ঘসতে না পারলে আর কাজ হলো না কেমন? জগতে গান আছে, বাজনা আছে, সুর আছে, তাই জগৎটা এখনো টিকে আছে, বুঝলেন বৌদি? তা' নইলে—যদি শুধু আপনার ওই ভাত সেদ্ধর হাঁড়ি থাকতো, আর সেরেস্তার খাতা থাকতো, তা'হলে বেচারী পৃথিবী মনের দুঃখে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরতো! গানের কাছে আর কিছু আছে?

কথার সঙ্গে সঙ্গে রীডের গায়ে আলতো ভাবে হাত বুলোচ্ছিলো গৌরাঙ্গ। কথা শেষ করে সুরের আর শব্দের ঝঙ্কার তোলে—'কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই। আমি তোমার প্রেমের কি বা জানি, আমি তোমার প্রেমের কি বা জানি!'

বাসন্তী এবার রীতিমতো প্রমাদ গণে।

শশধরের বাড়ী ফেরার সময় নিকটবর্ত্তী হচ্ছে, সুধাটাও এখনো এলো না! ঘন ঘন বাড়ীর প্রবেশ পথের দিকে তাকাতে তাকাতে সহসা যেন মনে পড়েছে এই ভাবে বলে—এই মাটি করেছে, রান্নাঘরে বোধ হয় শেকল দিই নি! একখুনি বেড়াল ঢুকে মাছটা—

—আরে বাসরে বাস! অমনি টনক নড়ে উঠেছে!

গৌরাঙ্গ বাজনাটা থামিয়ে সেটাকে একটু ঠেলে দিয়ে চটে মটে বলে—এই! এই জন্যেই আমার রাগ ধরে! একবার যদি সুস্থির হয়ে ছুদণ্ড বসবেন। আচ্ছা, এতো বড়ো মেয়ে আপনি, এতো ছটফটে কেন বলুন তো? যখনি একটু ভালো ভালো কথা হবে, অমনি আপনার ডাল পুড়বে, তরকারি পুড়বে, বেড়ালে মাছ খেয়ে যাবে—উঃ।

বাসন্তী যাবার জন্যে পিছন ফিরেছিলো, গৌরাঙ্গর কথায় হাস্যোজ্জল মুখ ফিরিয়ে ভ্রুভঙ্গীর সঙ্গে বলে—'ভালো ভালো' কথা পরের বৌকে শোনাবার কি দরকার বাপু? নিজের বৌকে নিয়ে সুস্থির হয়ে বসলেই পারো ছুদণ্ড?

গৌরাঙ্গ হতাশের ভানে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে—নিজের বৌ? সুধামুখী? হায় কপাল! গান শুনতে হলেই তা'র হাই ওঠে।

বাসন্তী ওর ভাবভঙ্গী দেখে খিল খিল করে হেসে না উঠে পারে না।···যতোই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বেশী হাসি কথা করবে না গৌরাঙ্গর সঙ্গে, শশধর যখন পছন্দই করে না, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা এই আত্মভোলা সদাহাস্য লোকটার সামনে এলেই কোথায় যেন তলিয়ে যায়। তাই হেসে উঠেই শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার শশধর এসে পড়লো কি না দেখে নেয়।

গৌরাঙ্গ বোধকরি এতোক্ষণ সুধার প্রসঙ্গ তুলবার সুবিধা পাচ্ছিল না বলেই প্রশ্ন করেনি। এবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে ওঠে—

ভালো কথা, সুধামুখী গেলেন কোথায়? এই দুপুর রোদে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছেন না কি?

কৌতুকপ্রিয় বাসন্তী কৌতুকের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে না, হাত মুখ নেড়ে বলে—কোথায় গেছে সে খোঁজে তোমার দরকার? সুধার দাদা বলেছেন—সুধাতে আর তোমাতে সম্পর্কটি হচ্ছে—সাপে আর নেউলে।

এবার হা হা করে হেসে ওঠার পালা গৌরাঙ্গর। হেসে উঠে বলে—বেশ কথা বলে শশধরদা। বুঝলেন বৌদি, দাদাকে আর দাদার বোনটিকে ক্ষেপিয়ে দিতে পারলে কিন্তু ভারী মজা লাগে।

বাসন্তী উচ্ছল ভঙ্গীতে উত্তর দেয়—তোমার মজা, আর আমার যে সাজা মশাই? এই দেখো না—তেতে পুড়ে এসে যদি দেখে, বৌ মানুষ সংসারের কাজ কর্ম্ম ভাসিয়ে দিব্যি গাল গল্প করছে, তা'হলে রাগের চোটে মুখখানি এই এ্যাতো—বড়ো একখানি হাঁড়ি—

হাতের ভঙ্গীতে হাঁড়ির আয়তন দেখায় বাসন্তী।

গৌরাঙ্গও হেসে উঠে নিজের হাতের ভঙ্গীতে আয়তন আর একটু বাড়িয়ে দেখিয়ে বলে—বেশতো আপনিও এই এ্যাত্তো—বড়ো এক হাঁড়ি ভাত বেড়ে দেবেন। ভাতই রাগের মহৌষধ, জানেন তো?

—হয়েছে মশাই থামো। উঃ তোমার সঙ্গে গল্প করতে বসলে হাসতে হাসতে মরতে হবে।

হাসতে হাসতেই ফের চৌকীটার উপর বসে পড়ে বাসন্তী।

গৌরাঙ্গ বলে—সেই জন্যেই তো বলছি, চুপ করে বসে গান শুনুন। কি বলবো বৌদি, আপনার যে চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ, নইলে আপনাকে আমি গান শিখিয়ে ছাড়তাম।

—গান? আমাকে? হি হি হি।

—ব্যস, হেসেই উড়িয়ে দিলেন? মেয়ে ছেলে গান গায় না? দেখে আসুনগে যান, না কলকাতায়? সত্যি, আপনার কথার গলাই এতো সুন্দর, গান গাইলে—

মুখের কথা মুখেই থাকে গৌরাঙ্গর, সহসা বীরদর্পে ছাতা বগলে নিয়ে শশধর বাড়ী ঢোকে। বাসন্তীর সব সাবধানতাই ব্যর্থ। কোন্ ফাঁকে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, আর কখন আর কতোক্ষণ যে শশধর এসে দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেছে স্তব্ধ হয়ে, কে জানে! বীরদর্পে প্রবেশটাই প্রথম চোখে পড়লো।

বাসন্তী তো ভয়েই কাঠ।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার স্ত্রী ও একবার ভগ্নিপতির দিকে তাকিয়ে শশধর ছাতাটি যথাস্থানে রাখে। বাসন্তী উঠে এসে ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়ানো সত্বেও গলার চাদরটা নিজে আনলায় তুলে রাখে, তারপর গৌরাঙ্গর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রোধ, ব্যঙ্গ আর তাচ্ছীল্যের সংমিশ্রণে গঠিত একটি অপূর্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিক্তকণ্ঠে বলে—কেন, বেশীদিন আর কোথাও ভাত জুটলো না বুঝি?

গৌরাঙ্গ কোঁচার কাপড়টা দিয়ে অভিনিবেশ সহকারে বাজনাটা ঝাড়তে ঝাড়তে সহজ অবহেলাভরে বলে—ভাত? ভাতের আবার অভাব? তবে ভগবান যেখানে যেদিন মাপান।

—হুঁ, তত্ত্বকথাও শেখা হচ্ছে দেখছি যে! কিন্তু তোমাকে এই বলে রাখছি গৌরাঙ্গ, এ বাড়ীতে এ সব চলবে না।

গৌরাঙ্গ অবোধ দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কি সব?

—এই সব গান বাজনা ইয়ার্কি। ভদ্রলোকের অন্দর মহলটা গান বাজনা করবার জায়গা নয়, বুঝলে? তোমার ওই মোদো মাতালের আড্ডা যাত্রার আখড়ায় ও চর্চ্চা করো গে।···যতো সব লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড।

জজের রায় দিয়ে, গায়ের ঘামে ভেজা জামাটা খুলে উঠোনের দড়িতে ছড়িয়ে দিতে দালান থেকে উঠোনে নামে শশধর, আর

বোধকরি ইচ্ছাকৃত অসাবধানেই বাজনাটাকে পায়ের একটা ঠোকর মেরে যায়।

বাসন্তী করুণ নয়নে ধীরে ধীরে সরে যায়, আর গৌরাঙ্গ ত্রস্তে ব্যস্তে সেটাকে সামলে নিয়ে বলে—আহাহা ইস্, একটু দেখে শুনে হাঁটতে হয় দাদা। বুঝলেন না তো কখনো এর মর্ম? কথায় বলে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।'

শশধর যাচ্ছিলো কুয়োতলার দিকে, ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—কী? আবার ছড়া কাটা হচ্ছে? খুব ভাগ্যি ওটার, যে শূট্ মেরে পগার পার করে দিইনি। কিন্তু আমার এই স্পষ্ট কথা গৌরাঙ্গ, তোমার ওই সখের বাজনা, আমার বাড়ীতে রাখা চলবে না। তোমার ওই অপেরা পার্টির আড্ডায় ফেলে রাখো গে যাও।

শশধর কুয়োতলার দিকে প্রস্থান করে, আর গৌরাঙ্গ সযত্নে বাজনাটি তুলে দালানে সাজানো বেঞ্চের উপর রক্ষিত ট্রাঙ্কের সারির একটার উপর বসিয়ে রাখতে রাখতে অস্ফুট স্বরে বলে—দূর শালা। আড্ডায় রাখলে জিনিষটা থাকবে? সেটা হলো বারো ভূতের জায়গা। বোঝে না কিছু, কথা কইতে আসে।

গৌরাঙ্গ বোকা হলেও এক একটা কথা বলে ভুল নয়। ভাতই যে রাগের মহৌষধ তাতে আর সন্দেহ কি!

খেতেও হয় না। পরিপাটি করে বাড়া অন্নব্যঞ্জনের সামনে বসেই মেজাজটা একটু নরম হয় শশধরের। হাতের তেলোয় জল নিয়ে গণ্ডুষ করে বলে—লক্ষ্মীছাড়াটা খেয়েছে?

বাসন্তী মাথা নাড়ে।

সুক্তর বাটি পাতে উপুড় করতে করতে শশধর কিঞ্চিৎ উদার সুরে বলে—তা' ওকে ভাত ক'টা আগে ফেলে দিলেই পারতে? বেলা তো বড় কম হয় নি?

বাসন্তী পাখা নাড়তে নাড়তে বলে—জানা তো ছিলো না। আবার ভাত চাপিয়েছি।

—এই দেখো! সাধে কি আর বলে মেয়েছেলের বুদ্ধি! গেরস্থ বাড়ীতে দুপুর বেলায় হাঁড়ীতে কখনো পেটমেপে চাল চড়াতে আছে? চারটি বেশী চড়াতে হয়।

—আর, ফেলা গেলে যে তোমার মা বকে অনর্থ করেন।

পাখা রেখে দুধের বাটিটা এগিয়ে দিতে দিতে কথাটা বলে বাসন্তী।

শশধর পাতের উপর মাছের মুড়োটা তুলে নিয়ে তাকে জব্দ করতে করতে বলে—ফেলা? ভাত আবার ফেলা যায় না কি? ভিখিরী নেই বাস্থলপুর গাঁয়ে? কুকুর নেই পাড়ায়? বেড়াল নেই বাড়ীতে?···ইয়ে, তোমারও খাওয়া হয় নি তো?

বাসন্তী অপরূপ একটা ভ্রুভঙ্গী করে বলে—হ্যাঁ, আগে ভাগে নিজে খেয়ে দেয়ে বসে আছি যে!

শশধর স্ত্রীর এই ভ্রুকুটি রঞ্জিত মুখের দিকে একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে।···বৌকে কি শশধর কম ভালোবাসে? তা তো নয়। একান্তে যখন দেখে বৌয়ের হাসি, কথা, দৃষ্টিভঙ্গী, সবেতেই তো মুগ্ধ হয়, কিন্তু দেখতে পারে না পাঁচজনের সামনে। তখন এই হাসি কথাই তা'র মনের মধ্যে অগ্নি বর্ষণ করে।

এখন একা, তাই ভ্রুভঙ্গীর প্রতিদানে মুচকি একটু হেসে বলে—ওতে আর দোষ কি? পতিভক্তি তো কতো?

বাসন্তী তার আয়ত দুটি চোখে একবার বঙ্ক গভীর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়, তারপর অভিমানের আমেজ লাগানো সুরে বলে—কেন, অভক্তিই বা দেখলে কিসে?

মনের সন্দেহ ব্যক্ত করবার এই একটা সুযোগ পায় শশধর, তাই পাতের ভাত সাপটে মাখতে মাখতে বলে—নয় কেন? আমি যা

ভালোবাসি না, যা ছ' চোখের বিষ দেখি, তাইতেই তো দেখি তোমার যতো স্ফুর্তি। এটা কি ভক্তির পরাকাষ্ঠা?

এটা অবশ্য কোন কথার গৌরচন্দ্রিকা, সেটা বুঝতে আটকায় না বাসন্তীর, তবু অবোধের ভঙ্গীতে বলে—তোমার যা ছ' চক্ষের বিষ তাই করে বেড়াচ্ছি আমি? বেশ! বেশ! এই যে দেশসুদ্ধ মেয়ে চণ্ডীতলায় যাচ্ছে, চতুর্ভুজ নারায়ণ দর্শন করছে, সে সব করেছি আমি? এমন পাপিষ্ঠা আমি যে, একবার মা চণ্ডীকে পর্য্যন্ত দর্শন করতে যেতে পাইনা।'

শশধর অবশ্য এমন কাঁচা ছেলে নয় যে, এ অভিযোগে বিচলিত হবে। তাই একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলে—মা চণ্ডী কি শুধু ওই মন্দিরেই আছেন? তোমাদের ঠাকুরঘরে নেই? জয়চণ্ডীর পট নেই তোমার ঘরে? ঘট আর পটই হলো আসল।

বাসন্তী বোধকরি সেই পটের উদ্দেশ্যেই একবার প্রণাম করে বলে —আহা তা না হয় হলো, কিন্তু নর নারায়ণ? তিনি তো আর আমাদের ঠাকুর ঘরে 'অধিষ্ঠান' নেই?

—নারায়ণ? চতুর্ভুজ?

হা হা করে হেসে ওঠে শশধর। হেসে বলে—যতো সব বুজরুকী। চণ্ডীর মেলায় সেবার চারপেয়ে মানুষ এসেছিলো শুনেছিলে? এও তাই। এবারে চার হাত। বোকা ঠকিয়ে পয়সা তোলবার ফন্দী।

স্বামীর নাস্তিকতা বাসন্তীর পরিচিত হলেও, এহেন নাস্তিকতায় শিউরে ওঠে। মনে মনে দেবতার কাছে স্বামীর অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে—চারখানা গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ সবাই বোকা, আর একা তুমিই যতো বুদ্ধিমান কেমন?

—আলবৎ।

ডান হাতটা এঁটো থাকার দরুণ বাম হাতটাই বুকে চাপড়ে শশধর বলে—সব বেটা বেটি একের নম্বরের বোকা। স্বর্গ থেকে ভগবান নেবেছে, ভুত ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছে! যতো সব রাবিশ!

বাসন্তীও রেগেছে। সে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলে ওঠে—বলবে না কেন? জগতে নেই কি? ভূতও আছে ভগবানও আছে। আসল কথা তো তা নয়। আসল কথা, দেশ সুদ্ধু লোকের পরিবার শ্যাওড়াগাছের পেত্নী, কেউ তাদের দিকে ফিরে তাকায় না, আর তোমার পরিবার একেবারে স্বর্গের অপ্সরী, পথে বেরোলেই দুনিয়া সুদ্ধু লোক হাঁ করে চেয়ে থাকে, তাই তোমার এতো জ্বালা!

কেউ যদি বলে শশধর একেবারে কাঠখোট্টা, রসজ্ঞানের বালাই মাত্র নেই তার, তা' হলে সে ভুল বলবে। রূপসী স্ত্রীর অভিমানস্ফুরিত মুখের আবেদন তার কাছেও কম নয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে বাঁ হাতে বাসন্তীর টোল খাওয়া গালে একটা টোকা দিয়ে শশধর নীচু গলায় বলে ওঠে—এই! এইটি যা বললে খাঁটি কথা। রূপসী বৌ থাকা কি কম জ্বালা?

বাসন্তী মুখটা একটু সরিয়ে নিয়ে দুষ্টু হাসি মাখা মুখে বলে—তা' হলে ওই রামী নাপতিনীর মেয়েটাকে বিয়ে করলেই হতো? তাহলে নির্ভয়ে পথে ছেড়ে দিতে পারতে!

বলা বাহুল্য নাপিতদের সেই মেয়েটা গ্রামের মধ্যে কুশ্রীতার জন্যেই বিখ্যাত।

শশধর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে—বৌ তো পথে ছেড়ে দেবার জিনিষ নয়, ঘরে ধরে রাখবার জিনিষ।

—ঘরে কেন, খাঁচায়।···এই মরেছে, ভাতটা বোধহয় গলে গেল। বলে ত্বরিত পায়ে চলে যায় বাসন্তী।

এসে দেখে রান্নাঘরের সামনে গৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে। সদ্যস্নাত খালি গা, রোদে দাঁড়িয়ে ভিজে পৈতেটাকে চেঁচে ঝেড়ে জল ঝরাচ্ছে।

খালি গায়ে রোদের আভা পড়ে ঝকঝক করছে যেন।

বাসন্তী দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ টিপে হেসে বলে—ঈস্। অঙ্গ থেকে

যে একেবারে আলো ঠিকরে পড়ছে। সাবান মাখা হলো বুঝি? আহা এমন রূপ ঠাকুরঝি একবার দেখল না গা?

বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কথাটা কিঞ্চিৎ খাটো গলায় উচ্চারিত হয়। পূর্ব কথা দুটিই তীক্ষ্ণ বাণের মতো গিয়ে বিদ্ধ করে দিবা নিদ্রার জন্য সুখশায়িত শশধরের হৃদয়।

চমকে শোওয়া থেকে উঠে বসে সে। চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে তার, চোখের দৃষ্টিতে আগুন ঝরে।

গৌরাঙ্গ সহাস্যে বলে—আহা, আপনার ঠাকুরঝি তো আমাকে কক্‌খনো সাবান মাখতে দেখেনি?…নিন, এখন্‌ ব্রাহ্মণ ভোজনটি সারিয়ে দিন দিকি? খেয়ে উঠে একবার চণ্ডীতলার দিকে যাই।

—সে কি! খেয়ে উঠে এখন?

—যাই।…দেয়ালে ঠেশানো পীঁড়িখানা পেতে বসতে বসতে গৌরাঙ্গ বলে—দেখি গে আবার সুধামুখী ভীড়ের ঠেলায় চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে সদ্য সদ্য নারায়ণ পেয়ে গেল কি না।

ভাতের থালাটা সামনে বসিয়ে দিয়ে বাসন্তী রহস্যব্যঞ্জক স্বরে বলে—হুঁ। টানটি তো বিলক্ষণ। দাদা আবার বলে 'সাপে নেউলে'!

—দেখা হলেই তাই। দেখবেন এসে কোঁদল সুরু করবে। বড্ডো মাথা মোটা বুঝলেম বৌদি? নইলে সুধামুখী আমাদের লোক ভালো।…হেসে উঠে আবার বলে—ইয়ে, বাদলাটা এখনো পাঠশালা থেকে ফিরলো না যে?

—পাঠশাল?

বাসন্তী হেসে ওঠে—পাঠশালেই গেছে বটে! পাড়ার কোনো ছেলেটা আজ ক'দিন পাঠশালে গেছে না কি? সব ওই চণ্ডীতলায় পড়ে আছে।

—বলেন কি? গেছে কখন?

—সেই কোন কালে।

শশধর একা ঘরে শুয়ে কড়ি বরগা গুণবে, আর বাসন্তী ঘন্টা-

খানেক ধরে তরিবৎ করে ননদাইকে খাওয়াবে, এ চিন্তা যদি শশধরের মাথায় আগুন ধরিয়ে না দেয়, তা হলে তো তাকে সিদ্ধপুরুষ বলা চলতো।

খানিকক্ষণ সে শুয়েছিলো জোর করে, কিন্তু ওদিক থেকে ক্ষণে ক্ষণে খিল্‌খিল্‌ হাসি, আর হা হা হাসির শব্দভেদী বাণ এসে তাকে আর বিছানায় তিষ্ঠোতে দেয়নি।···হাসির শব্দ থেমে গিয়ে তারপর নামলো নিস্তব্ধতা। তবু বাসন্তীর দেখা নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে হুঙ্কার দেবার দুরন্ত ইচ্ছাকে দমন করে পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতো ঘরের এদিক থেকে ওদিক্‌ অবধি পায়চারী করছিলো শশধর। দেয়ালে টাঙানো সাবেকী ঘড়িটা সময় হিসেবে ভুল চলে বটে, তবে মিনিটের হিসেবটা ঠিক রাখে। থেকে থেকে সেই দিকে তাকিয়ে রাগ আরো বাড়ছিলো।

অনেকক্ষণ পরে পানের ডিবে হাতে করে ঘরে ঢুকলো বাসন্তী। অবাক হয়ে বললো—ওমা এ কী? ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? শোওনি?

ঘাড় ফিরিয়ে রক্তচক্ষে একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শশধর মুখ ঘুরিয়ে ফের পায়চারী করতে থাকে।

পানের ডিবেটা বিছানার উপর নামিয়ে রেখে বাসন্তী স্বামীর কাছে গিয়ে গায়ে হাত ঠেকিয়ে বিস্মিত ব্যাকুল স্বরে বলে—কি হয়েছে গো?

শশধর এক ঝট্‌কায় তার হাতটা নিজের গা থেকে নামিয়ে দিয়ে তেমনি ভাবেই পায়চারী করতে থাকে। শুধু পদচারণা আরো দ্রুত হয়।

বাসন্তী এবার বুঝতে পারে আর কিছু নয়, রাগ। রাগের কারণও অনুমান করতে পারে। অতঃপর আর খোসামোদ করতে স্পৃহা হয় না তার। সূক্ষ্ম একটা অপমান বোধের জ্বালায় আহত স্তব্ধ মুখে কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে ধীরে

ধীরে ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা গোটানো মাদুরটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে।

শশধর চলতে চলতে থেমে পড়ে, গম্ভীর কণ্ঠে পিছন থেকে প্রশ্ন করে—যাচ্ছো কোথায় ?

বাসন্তীরই কি মান নেই ? সে এ প্রশ্নের জবাব দেয় না, শুধু ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। রাগ অভিমান অপমান সব কিছুর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে সে-মুখে।

শশধর এগিয়ে এসে মাদুরটাকে সবলে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একপাশে ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আবার এখন সোহাগের ঠাকুর জামাইয়ের কাছে যাওয়া হচ্ছে বুঝি ?

—ছিঃ ! ছিঃ !

কালো চোখে অগ্নি বর্ষণ করে বাসন্তী দরজার কপাটটা চেপে ধরে বলে—এ ভাবে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না ?

—লজ্জা ?

ক্রুর ব্যঙ্গ মিশ্রিত একটা হাসি হেসে শশধর তীব্র অথচ চাপা কণ্ঠে বলে—তা বটে, লজ্জাটা আমারই করা উচিত বৈ কি ? যারা পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে লজ্জা পায় না, তারাই তো বলবে একথা—

বাসন্তী দুই হাতে কান চেপে ধরে অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করে মাত্র, কথা বলে না।

শশধর হঠাৎ কি ভাবে কে জানে, বাসন্তীর একটা হাত ধরে টেনে এনে খাটের উপর জোর করে বসিয়ে দিয়ে তীব্র স্বরে বলে—খুব তো ইয়ে দেখানো হচ্ছে, এতোক্ষণ হচ্ছিলো কি ?

বাসন্তী কথা বলে না, শুধু আরক্ত মুখে স্বামীর মুষ্টি থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু কাঁকড়ার দাড়ার মতো সরু সরু অথচ কঠিন সেই আঙুল-গুলোর কবল থেকে হাতকে ছাড়িয়ে নেওয়া তার সাধ্যে কুলোয় না।

বৃথা চেষ্টার লজ্জায় বহুক্ষণের সঞ্চিত অশ্রুর ভার বড়ো বড়ো কয়েকটি ফোঁটায় চোখের কোল থেকে গড়িয়ে পড়ে। সুধা চণ্ডীতলায় যাওয়া অবধি মনের ভিতরটা তার কি ভারাক্রান্ত হয়েই ছিলো? ঈশ্বরই জানেন।

এবার একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে শশধর। বাসন্তীর চোখে জল! এটা ঠিক ধারণা করেনি শশধর। পরিহাসপ্রিয় বাসন্তী স্বামীর এই সন্দেহ বাতিককে প্রায়শঃই পরিহাসের হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। আজকেরটা ব্যতিক্রম।

হাতটা ছেড়ে দিয়ে শশধর ওর কাঁধটা ধরে মৃদু একটু নাড়া দিয়ে অপ্রতিভ স্বরে বলে—হঠাৎ একেবারে কেঁদে ফেলবার কি হলো?

বাসন্তী আর ধৈর্য্য ধরতে পারে না, উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

নাঃ, শেষ পর্য্যন্ত যে বাসন্তীই জব্দ করে ফেললো শশধরকে! দুটো ধমক টমক দেবার অবকাশ মাত্র না দিয়ে একেবারে কেঁদে আকুল হলো!

অথচ চুপকরে বসে বসে কিছু আর কাউকে কাঁদতে দেখা যায় না। অধৈর্য্য হয়ে শশধর ওর পিঠটা একটু ঠেলা দিয়ে বলে—এটা কি হচ্ছে? চুপ করো না। আর কি? মেয়েমানুষের এই এক ব্রহ্ম অস্ত্র আছে, কান্না! 'যা খুসি তাই করবো, আর কেউ শাসন করতে এলেই কেঁদে জিতবো।' ব্যস।

বাসন্তী এবার কান্না থামিয়ে উঠে বসে।

মুখে গালে কাঁধে ছড়িয়ে পড়া বিপর্যাস্ত চুলগুলো সরিয়ে পিঠে ফেলে দিয়ে অভিমান উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—জিতছে কে? হেরেই তো আছি। এতো শাসনেও আশ মিটছে না? বেশ তো, ধরে মারো এবার? সেটাই বা বাকী থাকে কেন?

—শাসন!...হুঁঃ শাসন! শশধর দাঁতে দাঁত পিষে চাপা গলায় বলে—শাসনটা মানছে কে? হাজার দিন বলিনি, ওই লক্ষ্মীছাড়া

শয়তানটার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা হাসি মস্করা আমি পছন্দ করি না ? দু' ঘণ্টা ধরে এতো কিসের গল্প হচ্ছিলো শুনি ?

বাসন্তী খাট থেকে নেমে পড়ে। সেকেলে আমলের বাজু দেওয়া ভারী পালঙ্ক, তারই একটা বাজু চেপে ধরে বলে—এতোক্ষণ আমি ওর সঙ্গে গল্প করছিলাম না কি ? ও তো কোন্ কালে বেরিয়ে গেছে ঠাকুরঝিকে খুঁজতে ! এতোক্ষণ তো তোমার মায়ের একাদশীর জল-খাবার গোছাচ্ছিলাম।

কথার শেষাংশ শোনবার ধৈর্য্য শশধরের থাকে না। চম্‌কে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে ওঠে—ঠাকুরঝিকে খুঁজতে মানে ? কোথায় গেছে সুধা ?

সুধামুখীর লুকোচুরিটা ফাঁস করে দেবার ইচ্ছে বাসন্তীর ছিলো না, কিন্তু এখন ও ভারী চটেছে। কারো উপর আর মমতা করবে না। তাই তাচ্ছিল্যের এক অপরূপ ভঙ্গী করে বলে—কোথায় আবার ? যেখানে গাঁ সুদ্ধু লোক যাচ্ছে।

শশধর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—চণ্ডীতলায় গেছে সুধা ?

বাসন্তী এবার মজা দেখতে চায়, তাই নিরীহ কণ্ঠে উদাস ভঙ্গিমা এনে মাথা হেলিয়ে বলে—গেছেই তো। যাবে না কেন ? ওর স্বামীর তো আর কড়া নিষেধ নেই ?

—ওর স্বামী ?

শশধর মাটিতে পা ঠুকে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—ওর স্বামী আবার একটা মানুষ না কি ? অপদার্থ জানোয়ার !···বলি আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে সে কোন্ সাহসে যায় ?

বাসন্তী ঘাড় ফিরিয়ে তেমনি উদাস কণ্ঠে বলে—সাহসের অভাব কার আছে ? আমার মতো ভাগ্য তো কারো নয় ? এতো বন্দী হয়ে আছি, তবু সন্দেহ, আর অবিশ্বাস !

শশধর এবারে কিঞ্চিৎ নরম হয়ে বলে—সন্দেহ অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে—আমি যখন পছন্দ করি না, তখন কেন ওটাকে অতো আস্কারা দেবে তুমি ?

বাসন্তী ক্রমশঃ নিজস্ব জোর ফিরে পাচ্ছে, তাই মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে বলে—আস্কারা আবার কি? যতোই হোক জামাই মানুষ, খাবার সময় একটু যত্ন করতে হবে না? আমার হাতে হাঁড়ি—কাজেই—

—জামাই ফামাই বুঝি না আমি। কাল থেকে তুমি ওর খাওয়ার সময় থাকবে না! আমার হুকুম।

বাসন্তী বিরক্ত ভাবে বলে—ব্যস! হুকুম একটা দিলেই হলো? খাওয়ার সময় থাকবো না তো, ঠাকুরজামাই কি নিজে ভাত বেড়ে নিয়ে খাবে?

শশধর আর একবার মেজেয় পা ঠুকে বলে ওঠে—যতো সব 'কাটানে কথা'! কেন, সুধা চব্বিশ ঘণ্টা করে কি? সে পারে না নদের চাঁদকে ভাত বেড়ে দিতে?

—সুধা!

অবজ্ঞা আর ব্যঙ্গ মিশ্রিত আর একটি অপরূপ ভঙ্গী করে বাসন্তী বলে—সুধা নইলে আর কে বরের ভাত বাড়বার জন্যে হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে! তার ততক্ষণ পাড়া বেড়ালে কাজ হবে।

—পাড়া বেড়ানো বার করছি! সুধার অভাবে খাটের বাজুর উপরই একটা প্রবল থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে শশধর বলে—শশধর ঘোষালকে কেউ এখনো চেনোনি। রাগলে তার জ্ঞান থাকে না বুঝলে? কাল থেকে ফের যদি দেখি সুধা পাড়া বেড়াচ্ছে, আর তুমি বসে সখের ঠাকুরজামাইয়ের পিণ্ডির জোগাড় করছো, তাহলে—

বাসন্তী শিউরে উঠে বলে—দুর্গা দুর্গা! রাগ না চণ্ডাল! ছোট বোনের কল্যাণ অকল্যাণ টুকুও মনে থাকে না?

—কল্যাণ!...দাঁতে দাঁত পিষে উত্তর দেয় শশধর—ছোট বোন যেদিন মার হেঁসেলে ভর্ত্তি হবে, সেদিন আমি হরির লুঠ দেবো।

আজীবন গ্রাম্য হাওয়ায় বর্দ্ধিত শশধরের মুখে এই মেয়েলি গালিটা অসম্ভব কিছু বেমানান লাগে না। পল্লীগ্রামের অনেক পুরুষই এমন মেয়েলি গালমন্দ ব্যবহার করে।

আর মেয়েরা ?

তারা নিতান্ত তুচ্ছ কারণে, অপর লোককে তো বটেই—আপন সন্তানের উপরও যে অভিশাপবাণী বর্ষণ করে, সে বাণীর কোনো শক্তি থাকলে যে কী হতো ঈশ্বর জানেন।

হয়তো তারা কোনো দিনই এ শাপ শাপান্তের অর্থ তলিয়ে দেখে না, শুধু ওপরওলাদের মুখ থেকে শুনে শুনে রপ্ত করে ফেলে।

বাসন্তী কি ভেবে একবার স্বামীর মুখের দিকে ভালো করে তাকায়।···সেই ঈর্ষাকাতর সন্দেহকুটিল মুখের দিকে তাকিয়ে তার যেন একটু মমতাই জাগে। একটুখানি তাকিয়ে থেকে স্বামীর বাহু-মূলে একটা হাত রেখে কোমল স্বরে বলে—আমার একটা কথার উত্তর দেবে ?

শশধর উত্তর দেয় না, শুধু ভুরু কুঁচকে প্রতিপ্রশ্নসূচক একটা দৃষ্টি হানে।

বাসন্তী তেমনি ভাবেই বলে—আচ্ছা, এই কথাটার উত্তর আমায় দাও, ঠাকুরজামাইয়ের ওপর তোমার এতো রাগ কেন ?

শশধর স্ত্রীর হাতটা এক ঝট্‌কায় ঝেড়ে ফেলে তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে—ন্যাকামী ! বোঝেন না কিছু !

বাসন্তী আহতভাবে বলে—বুঝি হয়তো কিছু কিছু ! কিন্তু বিশ্বাস হয় না !

শশধর মুখ বাঁকিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলে—বিশ্বাস না হবার হেতু ? শালাজ ননদাইয়ের মাখামাখির গল্প কখনো শোনোনি বুঝি ? জগতে ঘটে না এ সব ?

বাসন্তী হতাশ ভাবে বলে—আচ্ছা, ঠাকুরজামাই কি সেই রকম আস্ত একটা পুরুষ মানুষ গো ? ও তো একটা শিশু মাত্তর।

শশধর কপাল কুঁচকে বলে—শিশু ? বটে ? তা সে শিশু হ'তে পারে, তুমি তো আর শিশু নও ? কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত সে জ্ঞান তোমার নেই কেন ?

বাসন্তী কথা শেষ করার ভঙ্গীতে এলোচুলটা জড়াতে জড়াতে বেজার মুখে বলে—সে জ্ঞান আমার খুব আছে, নেই তোমাদেরই। দড়িকে সাপ ভেবে মুর্চ্ছা যাও। কি বলবো, ওকে তোমরা চিনলে না। এ সংসারে খল, কাপট্য, জটিলতা কুটিলতার অনেক উঁচুতে ও। তোমার এই বিচ্ছিরি সন্দেহর মানেও বোঝে না ঠাকুরজামাই।

শশধর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে দুই হাত পিঠের দিকে জড় করে পায়চারি শুরু করেছিলো, বাসন্তীর কথায় হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কটুকণ্ঠে বলে—না বোঝে না! খোকা! শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! আমরা কেউ চিনতে পারলাম না, অবতার চিনেছো শুধু তুমি। উঃ! নেহাৎ না কি পাড়ার লোকে জানাজানি হবে, তাই! নইলে কবে ওটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করে দিতাম!···তবে তোমাকে এই সাবধান করে দিচ্ছি বাসন্তী, এখনো যদি সামলে না চলো, দু'জনের কপালেই অশেষ দুর্গতি লেখা আছে!

যে মানুষটাকে নিয়ে শশধরের এতো বিষোদ্‌গার, সে মানুষটা কিন্তু আপন আনন্দে বিভোর। লম্বা লম্বা পা ফেলে চণ্ডীতলায় সে পৌঁছেছে, এবং ভীড়ের মধ্যে থেকে স্ত্রী পুত্রকে উদ্ধার করে টেনে বার করেও এনেছে।

এখন তিনটি মানুষে পথ মুখরিত করে বাড়ী ফিরছিলো।

যদিও সুধামুখী নাম মহিমায় পদ্মলোচনেরই সমগোত্র, তথাপি আপাততঃ তা'র মুখের ছবিতে প্রসন্নতা। কণ্ঠে আনন্দোচ্ছ্বাস! একেই তো চতুর্ভুজ দর্শনের আনন্দে মনটা ছল্‌ছল্‌ করছিলো, তা'র উপর দীর্ঘ বিরহান্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামী সন্দর্শন।

সুধামুখীর রঙ ময়লা, তবে মুখের কাটুনী মন্দ নয়। পাতলা পাতলা গড়নের জন্য বয়সের অপেক্ষা একটু কমই দেখায়। সাজের সখটা সুধামুখীর বিলক্ষণ, সব সময় ডুরে শাড়ীটি, ছিটের ব্লাউসটি,

আট সাঁট করে পরা, কপালের চুলগুলি সহজে স্থানভ্রষ্ট হয় না। মাথার পিছনে সর্বদাই চালচিত্রের মতো একখানা খোঁপা।

প্রত্যেকটি বিষয়ের মতো, এ বিষয়েও সে বাসন্তীর একেবারে বিপরীত। সাজ সজ্জার ব্যাপারে বাসন্তী নিতান্তই শিথিল প্রকৃতি। চুল তার প্রায় এলোই থাকে, যদি বা বাঁধে, যেমন তেমন করে। বেশের পারিপাট্যও নেই। অবশ্য নিজের তার সখ থাকলে পারিপাট্য করার সুযোগ হতো কি না সন্দেহ। সাদা শাড়ী ছাড়া আর কিছু শশধরের ছ'চক্ষের বিষ। আর নিভাননী, মেয়ের সখের জোগানদার হলেও, বৌয়ের 'ভাবন' সমর্থন করবেন এতোটা উদার নন। একটু বেশী চওড়া পাড় শাড়ী পরতে বাসন্তী ভালোবাসে, তাতেও 'ফ্যাসানের' ব্যাখ্যানা করেন তিনি।

সুধামুখী বেশ উচ্ছ্বসিত ভাবে বলতে বলতে আসে—নারায়ণ বললেন 'ছেলে রাজতুল্য হবে, আর স্বামীর মতি গতি বদলাবে'। সব বাইয়ের সব বলে দিচ্ছেন।

ছ'বছরের ছেলে বাদল 'রাজতূল্য' কথাটার অর্থ না বুঝলেও এটা যে একটা ভালো কথা তা বুঝলো। তাই প্রসন্ন বদনে ঘাড় উঁচু করে বাপের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করে এ হেন খবরটা বাবা কি আলোকে নিলো।

গৌরাঙ্গ বাদলের মাথাটা আদর করে একটু নেড়ে দিয়ে বলে—ছেলে 'রাজতূল্য' হবে সে তো আমিও বলতে পারি। কার ছেলে সেটা তো দেখতে হবে? কিন্তু স্বামীর মতি গতি বদলানো? সেটা কি ব্যাপার সুধামুখী? এ হতভাগ্যের মতির গতি তো ওই সুধার সাগরে, সে গতি বদলালে, তোমার গতি কি হবে?

হেসে হেসে বেশ হাত মুখ নেড়েই কথাটা বলে গৌরাঙ্গ, আর সুধা ওঠে রেগে। ঠাট্টা তামাসা জিনিষটা সে মোটেই বোঝে না। এ বিষয়ে দুটি ভাইবোন এক প্রকৃতির। রসিকতার রস গ্রহণ করবার

ক্ষমতা এদের নেই। পথের এদিকটা নির্জন, কিন্তু একদল লোক আসছিলো ওদিক থেকে, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুধামুখী বলে ওঠে—পথের মাঝখানে ঢং দেখো একবার! লজ্জা সরম যদি কিছু থাকে!

গৌরাঙ্গ কিন্তু মোটেই লজ্জায় কাতর হয় না। সহসা সুর করে গেয়ে ওঠে—

সখী লাজ রাখলে শ্যাম মেলে না
আমি লাজের মাথা খেয়েছি।
লাজ ছেড়েছি, কুল ছেড়েছি, তাই—
শ্যামেরে পেয়েছি!

ততক্ষণে সামনের দল কাছাকাছি এসে গেছে, গানের সুর শুনে দু'একজন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে যায়। সুধার নজর এড়ায় না সেটা। স্বামীর দিকে একবার কোপ কটাক্ষ হেনে সে পা চালিয়ে চলতে সুরু করে।

অতঃপর পিতাপুত্র।

বাদল মহোৎসাহে বলে—'হারমণি'টা এনেছো বাবা?

গৌরাঙ্গও পরমোৎসাহে বলে—হ্যাঁ রে বাবা! চল না দেখবি। শিখতে পারবি তো?

—খু-ব। শিখে গেলে পার্ট দেবে তো আমাকে?

—দেবো না কি রে? সেই জন্যেই তো শেখানো। তোকে আমি বৃষকেতুর পার্ট দেবো।

খুসিতে মুখ চকচক্ করে বাদলের। চলতে চলতে হঠাৎ আবার বলে ওঠে—বাবা গান গাইলে মামা যদি বকে?

গৌরাঙ্গ সে আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বলে—দূর! গান গাইলে আবার বকে না কি কেউ? গান হলো স্বর্গের জিনিষ।

পবিত্র সুন্দর একটি ভাব ফুটে ওঠে গৌরাঙ্গর মুখে।

বাদল বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করে—স্বর্গের?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

ছোট্ট বাদল পরেছে একটা ধুতি আর কোট। ধুতির কোঁচাটা ক্রমান্বয়ে গুঁজতে গুঁজতে বেশ খানিকটা স্ফীতোদর করে তুলেছে তাকে, তবু কোঁচা নিয়ে অস্বস্তির শেষ নেই তার।

গৌরাঙ্গ বলে—কিরে বাদলা, হাঁটতে পারছিস না? কোলে চড়বি?

—ধ্যেৎ! বলে বাদল সজোরে পা চালায়।

সুধামুখীর কাছাকাছি এসে পড়ে দু'জনে।

গৌরাঙ্গ হাঁক পাড়ে—ও সুধারাণী, অতো জোরে পা চালাচ্ছো কেন? ক্যাঙারুর মতো দেখাচ্ছে যে?

সুধামুখী মুখ ফিরিয়ে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আরো জোরে হাঁটতে সুরু করে।

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে বাদল, মার ছুট্‌ দেখে। তারপর হাসতে হাসতে বলে—বাবা, মাকে তুমি খালি রাগ করিয়ে দাও কেন?

গৌরাঙ্গ হো হো করে হেসে উঠে বলে—ওরে ব্যাটা, তুমি সব ধরে ফেলতে শিখেছো? রাগী লোকদের রাগাতে ভারী মজা লাগে রে!···তোর মা, দিদিমা, আর মামা, এই তিনজনকে রাগতে দেখলে বেদম হাসি পায় আমার।

পিতা পুত্রের হাস্যে পল্লীপথ মুখর হয়ে ওঠে।

এবং এ হাসি যে সুধামুখীকেই উপলক্ষ্য করে এ কথা অনুমান করে সুধামুখী রাগে গনগন করতে করতে বাড়ী ঢোকে—ঝনাৎ করে দরজাটা ঠেলে।

গৌরাঙ্গ আর বাদল কিন্তু দরজা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় 'অপেরা পার্টি'র আখড়ার উদ্দেশে।

অন্য দিন হলে বাসন্তী গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গে সুধামুখীকে কলহাস্যে সম্বর্ধনা করতো, কিন্তু আজ তার চিত্ত ভারাক্রান্ত। ম্লান মুখে বসে

রাতের রান্নার জন্য কুটনো কুটছিলো, সুধার আবির্ভাবে একবার মুখ তুলে তাকিয়েই ফের নিজের কাজে মন দিলো।

সুধার চিত্তও ভার হয়ে উঠেছে। মনের সুর তার কেন এমন করে কেটে যায়?···ভীড়ের মধ্যে সহসা স্বামীর মুখখানি দেখতে পেয়ে মনটা তো আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো, পরমানন্দেই গল্প করতে করতে আসছিলো, কোন্ ফাঁকে কি যে হয়ে গেলো।

নিজের দোষ বুঝতে পারে না সুধা। অবশ্য কেই বা পারে সেটা? দোষী করে স্বামীকেই। গৌরাঙ্গ তা'কে অবহেলা করে। কারণটাও জলের মতো সোজা। গৌরাঙ্গ রূপবান, সে রূপহীনা।

দাওয়ার ধারে বসে থাকে সুধা পা ঝুলিয়ে, গালে হাত দিয়ে। বসে বসে ভাবতে থাকে·· নারায়ণ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, স্বামীর মতি ফিরবে। কেমন সেই ফেরা?

ভাবতে ভাবতে বঙ্কিম কটাক্ষে এক একবার ভ্রাতৃজায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সুধামুখী। ওই, ওইটিই হচ্ছেন তার ভাগ্যের শনি। স্বামী রূপসী শালাজের রূপে গুণে একেবারে মোহিত!

ভাইয়ের মতো সন্দেহটা স্পষ্ট প্রকাশ করে না বটে সুধামুখী, ঘোরালো কিছু একটা বিশ্বাসও করে না, তবে স্বামী যে বাসন্তীর রূপ গুণকে বেশ একটু প্রাধান্য দেয়, এ তো তার অগোচর নেই। জ্বালা তো ওইখানেই।

খানিকটা পরেই বেড়ার দরজা ঠেলে বাদলকে নিয়ে গৌরাঙ্গ ঢোকে, আর সুধাকে ও রকম গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে সশব্দে হেসে উঠে বলে—বা রে শকুন্তলা! কিন্তু এ সময় দুষ্মন্তর প্রবেশটাতো ঠিক হলো না? দুর্বাসা ঠাকুরের আগমন হলেই মানাতো!

সঙ্গে সঙ্গে বাদল বলে ওঠে—মামা তো কাছারী গেছে বাবা?

—মামা! গৌরাঙ্গ অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকায়।

বাদল অম্লান বদনে বলে—বাঃ মামার নামই তো দুর্ব্বাসা ঠাকুর! মামী যে বলে! মামা এলে মাকে শাপ দিতো বাবা?

সুধামুখীর আর সহ্য হয় না, উঠে এসে ছেলের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য, এই প্রহারের সরব প্রতিবাদ করে ওঠে বাদল। বাসন্তীর আর নির্লিপ্ততার ভান চলে না। উঠে এসে ছেলেটাকে ভুলিয়ে নিয়ে কাছে বসায়। বলে—মা মারলে কাঁদতে নেই গোপাল! এসো তো, চারটি কড়াইসুঁটি ছাড়িয়ে দাও তো আমার। পুলি গড়ে দেবো।

'পুলির' সংবাদে বাদলের মুখটা উজ্জ্বল দেখায়। মামীর কাজ করা সূত্রে কড়াইসুঁটি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে একমনে মুখে ফেলে যায়, বাসন্তী বাঁকা কটাক্ষে দেখে আর হাসে।

মুখভর্তি কড়াইসুঁটি নিয়ে বাদল সোৎসাহে বলে—বাবার সঙ্গে আখড়ায় গিয়েছিলাম মামী বুঝলে? বাবা বলেছে আমাকে 'বেরষো-কেতু'র পার্ট দেবে।

সুধামুখী ছেলেকে মেরে আবার বসে পড়ে রাগে হাঁপাচ্ছিলো, ছেলের কথায় ফের দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে স্বামীকে উদ্দেশ করে তেড়ে আসে—বটে! বটে! বাদলাকে তুমি যাত্রার দলে ছোঁড়া করবে? যেমন বুদ্ধির ছিরি, তেমনি তো কথা হবে! বুঝে বুঝে ছেলের জন্য কেমন 'পার্ট' বেছেছেন! বৃষকেতু! তা তুমি যেমন লক্ষ্মীছাড়া বাপ, ছেলেকে তুমি কাটতেও পারো।

গৌরাঙ্গ রাগও করে না, আহতও হয় না, বলে—আরে বাবা কেটে জোড়া দিতে পারলে কাটতে ভয়টা কি? বাদলাকে আমি এখন থেকেই তালিম দেবো, বয়েস বেড়ে গেলে শিখতে পারবে না। দেখি তো আখড়ায়।

কথাটা মিথ্যা নয়। দেখি—নয়, এখনি দেখে এসেছে আখড়ায়। দশ দিনের অনুপস্থিতির ফুটোটা মেরামত করতে আজই গিয়েছিলো বাদলকে সঙ্গে নিয়ে।

যেতে মাত্র সকলেই হৈ হৈ করে উঠলো।

—জামাইবাবু! জামাইবাবু! কবে এলেন? কোথায় যে ডুব মারেন হঠাৎ!

এ গ্রামের জামাই বলে, পাড়া সুদ্ধ ছেলেরই গৌরাঙ্গ 'জামাইবাবু'।

অভ্যর্থনার পালা মিটলে, গৌরাঙ্গ সুস্থির হয়ে বসে বলে—তারপর? পার্টগুলো মুখস্থ করে ফেলেছিস?

হঠাৎ সভাস্থল নিস্তব্ধ।

—কি হলো রে হঠাৎ বোবা হয়ে গেলি যে সবাই? মুখস্থ হয়নি?

এবার একটা অস্ফুট গুঞ্জন ওঠে।—'বল্‌না'? 'তুই বল্ না?' 'বেশ বলে দিচ্ছি। আমার কি?'

—আরে বাবা হলো কি?

গৌরাঙ্গ উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত প্রসারিত করে প্রশ্ন করে।

এবারে একটি ছেলের মুখ ফোটে, শুধু ফোটে না, খৈ ফোটে।

—ও পালা চলবে না।

গৌরাঙ্গ বসে পড়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—ও পালা চলবে না?

—না! কেউ বিদুর সাজবে না।

গৌরাঙ্গ ছেলেটার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলে—কেউ বিদুর সাজবে না? বলিস কি? বিদুরই তো হিরো। দেখছিস না পালার নাম 'বিদুরের খুদ'?···স্থাপলা, তোর না বিদুর সাজবার কথা ছিলো?

স্থাপ্‌লা বীর বিক্রমে মাথা নেড়ে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে এবং 'গোঁ' ভরে বলে—আমি সাজবো না!

—তা'হলে প্রাণকেষ্ট নে পার্টটা? তোকেও মন্দ মানাবে না।

—ন্ না!

—কী মুস্কিল! কেন বল্ তো? পড়ে দেখেছিস পালাটা? কী পার্টখানা! ভাল করে লাগাতে পারলে, দর্শকরা কেঁদে ভাসিয়ে দেবে।

কিন্তু এ হেন প্রলোভনেও কারো মন গলে না। সব কটা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে গৌরাঙ্গ, প্রত্যেকের মুখেই একটি অনমনীয় ভাব।

গৌরাঙ্গ হতাশ ভাবে ইঁট দিয়ে উঁচু করা পায়াভাঙ্গা চৌকীটার উপর বসে পড়ে বলে—কি হলো বল্ দিকি? বিদুর সাজতে আপত্তিটা কি?

একটা ছেলে এবারে মুখটা প্যাঁচার মত করে বলে ওঠে—বিদুর যে গরীব!

গৌরাঙ্গ তো হতভম্ব।

—বিদুর গরীব তা' তোদের কি? তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছিস না তো?

—আহা! 'আমাদের কি' মানে? যে বিদুর সাজবে, সে মুকুট পরতে পারে? ভেলভেটের পোষাক পরতে পারে?

গৌরাঙ্গ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বলে—সকলে মুকুট আর ভেল-ভেটের পোষাক পরতে চাস?

ছেলেটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করে বলে—চাইই তো! রাত্তির দিনই তো ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে কাটছে, যাত্রা ঠিয়েটার করতে বসেও তাই পরবো? জরি ভেলভেট পরে নেবো না একবার? এই মান্‌কে তো বিদুরের বৌ সাজবে, বেনারসী শাড়ী নইলে পরবে না বলছে!

গৌরাঙ্গ মাথায় হাত দিয়ে বলে—সর্ব্বনাশ করেছে! এ সব খেয়াল তোদের মাথায় কে ঢোকালো?

মান্‌কে নকল মিহি গলায় বলে—ঢোকাবে আবার কে? ছাই দেখানো, ভালো দেখানো, বুঝতে পারি না বুঝি?

গৌরাঙ্গ তাদের অনেক প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে—ভালো অভিনয় করাটাই আসল, ভালো দেখানোটা যে কিছুই নয়, বোঝায় সে কথা। একটা ভিখিরীর পার্ট প্লে করেও দর্শককে মুগ্ধ করা যায়, সে কথাও বলে ভালো করে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। ন্যাপলা

প্রাণকেষ্ট দু'জনেই বিদুর সাজতে রাজী আছে ওই এক সর্ত্তে, ভেলভেটের পোষাক, জরির মুকুট।

শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে—মাণিক তুই তোর পার্ট মুখস্থ করতে পেরেছিস ?

মাণিক সহসা তড়াক করে লাফিয়ে চৌকীর উপর উঠে বলে—আগাগোড়া। একটু শুনবেন ?—বলেই নকল মেয়েলি সুরে চিল চীৎকার জুড়ে দেয়—

'কি বা ভাগ্য অধমার আজি !
আপনি আসিলা প্রভু—
এ দীন কুটিরে !'

গৌরাঙ্গ তার কাপড়ের একটা খুঁট ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে কাতর বচনে বলে—থাম্ বাবা, হয়েছে ! ও তোদের দ্বারা হবে না ! অতো করে বোঝালাম সেদিন, এ কথাগুলো হবে ভক্তিতে গদগদ, ঠাণ্ডা গলায়। নারায়ণ এসেছেন বিদুরের কুটিরে—

—আচ্ছা আস্তেই বলছি—বলে ছেলেটা ফের দাঁড়িয়ে উঠে তীক্ষ্ণ সানুনাসিক স্বরে সুরু করে—

'কিন্তু কি বা
আছে মোর ? নাহি পূজা
উপচার, নাহি ভোজ্য পেয়।'

গৌরাঙ্গর মুখে ফুটে ওঠে নিরাশা !

—বেশ হয়েছে বাবা, আজ এই অবধি থাক !—বলে ম্লান মুখে উঠে পড়ে গৌরাঙ্গ।

বাদলও বাপের পিছন পিছন চলতে সুরু করে। এতক্ষণ সে পুতুলের মতো নির্বাক বসে ছিলো, পথে বেরিয়ে বলে—ওরা কিছু বুঝতে পারে না, না বাবা ?

গৌবাঙ্গ ছেলের মাথাটা একটু নেড়ে দিয়ে হতাশ সুরে বলে—না বাবা ! কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

পড়ন্ত বেলায় গৌরাঙ্গ সন্ত-সংগৃহীত বাদ্যযন্ত্রটি আবার কাঁধে ফেলে রওনা দিলো স্টেশনের দিকে। খালি গায়ে একটা উড়ুনী জড়ানো, বাতাসে তার কোণ উড়তে থাকে, নির্জন মেঠো পথ দিয়ে আপন মনে চলতে থাকে সে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে।

'স্টেশন' বলতে যে মস্ত একটা কিছু, তা' নয়। প্লাটফরম বলতে খানিকটা অসমতল জমি, আর জড়ো করে রাখা চারটি খোয়া'র গাদা। রেল কোম্পানী ভবিষ্যতে এ জায়গাটার উন্নতি সাধন করবেন, এই আশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ এই পাথরের নুড়ি খোয়াগুলি স্তুপীকৃত করা আছে। এরই মাঝখানে দুটো কাঠের খুঁটিতে আটকানো একখানা কাঠের ফলকে লেখা 'বাসুলপুর'। জলে ভিজে আর রোদে পুড়ে সে লেখা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। অনতিদূরে একটা ইঁদারা, আর তারই আশেপাশে কতকগুলো ঝুমকো জবার গাছ।

স্টেশন যখন, তখন তার একটা মাষ্টারও আছে। একখানা টিনের শেডের নীচে, স্টেশন মাষ্টারের অফিস ঘর, গুদাম ঘর, ওয়েটিং রুম ইত্যাদি সব কিছু।

'স্টেশন মাষ্টার' নামের গৌরব বহন করে যিনি এখানে বিরাজিত, যদিও দিনে রাত্রে দু'টিবার তাঁর ডিউটি—বেলা চারটেয় একবার ট্রেন আসে, আর রাত চারটেয় একবার ট্রেন ছাড়ে—কিন্তু অলিখিত আইনে বাসুলপুর স্টেশনের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সবই তাঁর ডিউটি।

কাঁচাপাকা গোঁফ, নাতিদীর্ঘ হৃষ্টপুষ্ট গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বিপত্নীক কি চিরকুমার, সে কথা এখানের কেউ জানে না। টিনের ওই শেড্টার নীচেই একটুখানি আড়ালের মধ্যে তাঁর একটা তোলা উনুনের গৃহস্থালী। রেঁধে বেড়ে খান, কোম্পানীর কাজ বজায় করেন এবং অবসর হলেই যাত্রার পালা লেখেন।

সেই সূত্রেই গৌরাঙ্গর সঙ্গে আলাপ।

গৌরাঙ্গর একান্ত অন্তরঙ্গ বলতে বোধকরি এই 'মাষ্টার দা'। বয়সের ব্যবধান এখানে লুপ্ত। গৌরাঙ্গকে কারো দরকার পড়লে অবধারিত যে সে আগেই খুঁজতে যাবে স্টেশনে। টিনের শেড দেওয়া ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে একজন একটা টুলে, আর একজন হয়তো একটা বোঝাই বস্তার উপর বসে আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্ন একটা যাত্রার দল খোলার। একটা যাত্রা পার্টি খুলতে যা কিছুর দরকার সবই এষ্টিমেট হয়ে আছে তাদের, শুধু টাকা জোগাড় হলেই হয়। তার জন্যই পাড়ার ছেলেদের নিয়ে আখড়া খুলে তালিম দেওয়া! যদিও তাদের একটাও মনের মতো নয়—গৌরাঙ্গর ভাব-জগতে পৌঁছতে পারে না তারা। তবু মধুর অভাবে গুড়ের মতো তাদেরই গড়াপেটা চলছে।

ভবিষ্যতের জন্য নামকরণও হয়ে আছে একটা।

'ভবঘুরে অপেরা পার্টি।'

বাইরে থেকে 'পালা' সংগ্রহ করবার প্রয়োজন তাদের নেই। মাষ্টারদা নিঃসঙ্গ অবসরের মুহূর্ত্তগুলিও বৃথা অপচয় করেন না। রেল কোম্পানীর দৌলতে সংগ্রহকরা দিস্তে দিস্তে বালির কাগজের উপর অবিরত কলমের আঁচড় টেনে চলেন।

দূর থেকে গৌরাঙ্গকে দেখতে পেয়েই স্টেশনমাষ্টারমশাই প্রায় দু' বাহু প্রসারিত করে টুল ছেড়ে উঠে আসেন। উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেন—আরে এসো এসো গোরাচাঁদ! নদে ছেড়ে কোথায় কাটিয়ে এলে এতোদিন? পেরেছো জোগাড় করতে?—এ কথাটা হারমোনি-য়মটির উদ্দেশে উচ্চারিত হয়।

গৌরাঙ্গ কাঁধ থেকে বাজনাটা নামিয়ে সন্তর্পণে একটা প্যাকিঙ্ বাক্সের উপর রেখে বলে—আর বলেন কেন মাষ্টারদা, সেই ব্যাটা গোবর্দ্ধন অধিকারী কি এইটার জন্যে কম ভোগান ভুগিয়েছে? আমি হতভাগার আশ্বাস পেয়ে ছুটে গেলাম, আর আমার গরজ দেখে বলে কি না 'দেবো না'।

যেন এমন বিস্ময়কর ঘটনা জগতে আর কখনো কোথাও ঘটে না। মাষ্টারমশাইও অবশ্য এ বিস্ময়ে যোগ দেন। অবাকের ভানে বলেন—বলো কি ?

—তবে আর বলছি কি ? আজ দশ দিন তার সঙ্গে ঘুরছি। ও যতো টালবাহানা করে, আমিও ততোই চেপে ধরি। আমাদের 'ভবঘুরে অপেরা পার্টির' একটা জিনিষ হলো তা'হলে, কি বলেন মাষ্টারদা ?

খুসি উপচে পড়ে গৌরাঙ্গর মুখে চোখে।

স্টেশন মাষ্টারমশাইও অবশ্য ভাবে-ভোলা গোছের লোক, তবু গৌরাঙ্গর চাইতে অনেক দিন আগে তিনি এ পৃথিবীতে এসেছেন। তাই সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে জিনিষটার দিকে বারকয়েক তাকিয়ে অল্প একটু হাত বুলিয়ে বলেন—বেশ করে দেখে শুনে নিয়েছো তো ? বাজবে ?

—বাজবে না মানে ? গৌরাঙ্গ মহোৎসাহে বলে—আমি কি তেমনি বোকা না কি ? অধিকারীকে দিয়ে বাজিয়ে নিইনি ? আজ বাড়ীতে এনেও বাজিয়েছি, দেখুন না—বলে মাষ্টারের টেবিলের উপরকার জিনিষপত্র সরিয়ে একটু জায়গা করে নিয়ে হারমোনিয়মটি বসিয়ে রীডের উপর হাত বুলোয়। আলতো থেকে প্রবল। হাত বুলোনো থেকে মারধোর।

কিন্তু এ কী বিপত্তি !

গোবর্দ্ধন অধিকারীর যন্ত্রটাও যে গোবর্দ্ধনের মতো অভদ্রতা সুরু করলো। ডু' একটা রীড তুমুল আর্ত্তনাদ করতে থাকে, আর গোটাকতক যেন ভারসাম্য রক্ষার্থেই একেবারে মৌনাবলম্বন করে বসে থাকে।

রীডের খাঁজে খাঁজে ফুঁ দিতে দিতে ঘেমে ওঠে বেচারা।

শেষ পর্য্যন্ত মাষ্টারমশাই বলতে বাধ্য হন—একটু বেশী পুরনো বলেই মনে হচ্ছে গোরাচাঁদ !

গৌরাঙ্গ মুখ তুলে বলে—আহা, পুরনো নয় তাতো বলছি না।

পুরনোর দোষ কি? আপনিও তো পুরনো, গুণী কি না সেইটাই দেখা দরকার। কিন্তু অধিকারী শেষটায় আমাকে ঠকালো?

গৌরাঙ্গর মর্মাহত মুখের প্রতি তাকিয়ে মাষ্টারমশাই সান্ত্বনার ছলে বলেন—একটু সারিয়ে টারিয়ে নিলে—

—সারাবো আর কোথায়? গৌরাঙ্গ হতাশভাবে বলে—এক তো আমাদের গদাইয়েব দোকান? লিখে রেখেছে, সর্ব্বপ্রকার বাদ্য-যন্ত্র মেরামত করা হয়, ওই পর্যান্তই। কারিগর নেই।

—তাই তো!

বিষণ্নমুখে গৌরাঙ্গ বলে—ক্রমশঃই যেন অথই জলে পড়ে যাচ্ছি মাষ্টারদা! ছেলে কটাকে অতো করে তালিম দিয়ে গেলাম, সব ভেস্তে বসে আছে! বলে কি না কেউ বিদুর সাজবে না!

মাষ্টারমশাইয়ের অনেক আশার জিনিষ সেই 'বিদুরের খুদ।' অনেক কেটে কুটে অনেক ভেবে লেখা। এ হেন সংবাদে তিনি চমকে উঠে বলেন—কেউ বিদুর সাজবে না?

—না! সাজতে পারে যদি জরির মুকুট আর ভেলভেটের পোষাক পরতে দেওয়া হয়!

—বলো কি গৌরাঙ্গ?

—বলবার কিছু নেই মাষ্টারদা, বড্ডো হতাশ করছে সবাই। চরিত্রের ভাব বুঝতে পারে না, রস বুঝতে পারে না, কিসে ভালো দেখাবে এই চেষ্টা! আর হারমোনিয়মটাও এই বিপদ করলো!

বিষণ্ন মুখে বসে থাকে দু'জনে কয়েক সেকেণ্ড।

আবার সহসা গৌরাঙ্গ গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। বলে—যাকগে—ভালোই হলো মাষ্টারদা, গোড়াতেই একটা লোকসান হয়ে দোষ খণ্ডে গেলো। এরপর আর আমাদের 'ভবঘুরে অপেরা পার্টি'র লোকসান হবে না।

মাষ্টারমশাই ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলেন—তা বটে গোরাচাঁদ ঠিক

বলেছো। এটা আমার মনে লাগছে। যেমন 'টিকে' নিলে বসন্তর ভয় কাটে। কি বলো?

বয়সে অনেক ছোট বন্ধুটিকে এইভাবে শিশুর মত ভোলান মাষ্টারমশাই।

আবার এ পক্ষও ভোলায় বৈ কি। কোথায় অপেরা পার্টি তার ঠিক নেই, পালার পর পালা জমছে, তবু নতুন পালার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে গৌরাঙ্গ।

তাড়া লাগিয়ে বলে—'অহল্যা উদ্ধারে' হাত দিলেন মাষ্টারদা? এই বেলা সুরু করুন? এরপর যখন পার্টি খুলবো, তখন যে আর সময় কুলিয়ে উঠতে পারবেন না।

মাষ্টারমশাই উদাসীনতার ভাবে বলেন—আরে ভাই, লিখলাম তো অনেকগুলো। সাপ ব্যাঙ কি হলো ঈশ্বর জানেন! দু' একটা পালা অভিনয় না হলে, তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না।

গৌরাঙ্গ জানে উৎসাহের শেষ নেই মাষ্টারমশাইয়ের। হয়তো ইতিমধ্যে লেখা হয়েও গেছে, এ শুধু একটু চক্ষুলজ্জা। খানিকটা পরেই উসখুস করে বলবেন—করেছিলাম খানিকটা হিজিবিজি, দেখ তা'হলে হচ্ছে কি না!

অতএব নিজেই সে সেই চক্ষুলজ্জা দূর করতে হৈ হৈ করে ওঠে—'উৎসাহ পাচ্ছি না' মানে? বলি অপেরা পার্টির কাজ আরম্ভ হলে সময় পাবেন? তখন যে ইষ্টিশান মাষ্টার থেকে একেবারে ডিরেকশন মাষ্টারে প্রমোশন।

এই রসিকতাটুকুতেই প্রাণ খোলা হাসি হাসে দুজনেই।

হাসি থামিয়ে গৌরাঙ্গ বলে—আমি কোথায় ভাবতে ভাবতে আসছি, এ কদিনে 'অহল্যা উদ্ধার' শেষই হয়ে গেলো বুঝি। আর আপনি কি না কলম গুটিয়ে বসে আছেন?

মাষ্টার যেন তাচ্ছিল্যভরে বলেন—হ্যাঁ শেষ না হাতী! করছিলাম

খানিকটা। ইয়ে—তেমন সুবিধে হচ্ছে না। আচ্ছা—দেখো দিকি একটু—

দ্রুত চাঞ্চল্যে টেবিলের ড্রয়ার খুলে কাগজের গোছা টেনে বার করতে চেষ্টা করেন মাষ্টার। এটা টানতে ওটা হাতে উঠে আসে, অতঃপর খোলা কাগজগুলি গোছ করে সরে আসেন জানলার দিকে।

বয়সের ভার মনকে জব্দ করতে পারেনি, কিন্তু জব্দ করেছে বহিরিন্দ্রিয়কে। পড়তে আজকাল চোখটায় কেমন কষ্ট হয়। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এসেছে, বাইরের মাঠে এখনো সোনাঢালা আলোর রেশ থাকলেও ঘরের ভিতরটা পড়া লেখার অনুপযুক্ত।

গৌরাঙ্গ তাঁর ব্যর্থ চেষ্টা দেখে ব্যস্ত হয়ে বলে—বাইরে গিয়ে বসলে হতো না মাষ্টারদা?

মাষ্টার মশাই ক্ষুব্ধ হাস্তে বলেন—না, না, বাইরে তেমন—ইয়ে—ঠিক জমে না। আজ আর হলো না ভায়া!

গৌরাঙ্গ হাতটা ঈষৎ বাড়িয়ে বলে—তা' আমাকে না হয় দিন না?

—না না, সে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না ভাই,—কুণ্ঠিতভাবে বলেন—অনেক কাটাকুটি আছে, নিজে নিজে না হলে, মানে—আর কি—না না আজ থাক। তার চেয়ে তুই বরং একটা কের্ত্তন গা?

—এখন? মানে—এই সন্ধ্যের সময়?

—এই দেখো, সন্ধ্যেই তো গানের সময় রে!

গৌরাঙ্গকে গানের জন্য বেশী অনুরোধ করতে হয় না, বলে—চলুন তাহলে বাইরেই।

খোয়ার গাদার উপর বসে পড়ে গুন্‌গুন্ করতে করতে এক সময় গলা খুলে যায়। আসন্ন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে গায়ককে ভালো করে দেখা যায় না, শুধু তার উদাত্ত কণ্ঠস্বর যেন কাঁপতে কাঁপতে আকাশে উঠে আবার করুণ মূর্চ্ছনায় পৃথিবীতে নেমে ধূলিকণায় মিলিয়ে যায়।

দ্বিতীয় কোনো শ্রোতা নেই। প্রৌঢ় একটি গ্রাম্য স্টেশন মাষ্টারের বিহ্বল কানে বারবার ধ্বনিত হতে থাকে—

'সখী রহিতে নারিনু ঘরে!
(সবাই) নিরবধি বলে কানু-কলঙ্কিনী,
এ কথা কহিব কারে—'

এতো স্ফূর্তিবাজ লোকটা, কিন্তু সুরের মধ্যে যেন বেদনা গলে গলে পড়ে। কে জানে এতো হাসি খুসির নীচে কোথায় লুকোনো থাকে এই বেদনার সাগর! কেনই বা আছে?

মাষ্টারমশাই ঘন ঘন কোটের হাতায় চোখ মোছেন। গান শেষ হয়ে গেলে রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—রাতদিন তো হেসে বেড়াস, গানের ভেতর এমন করে কাঁদিস কেন বল্ তো? আপনি কাঁদিস, পরকে কাঁদাস।

গৌরাঙ্গ একটা নিশ্বাস ফেলে উদাসস্বরে বলে—কি জানি মাষ্টারদা, গান গাইতে গেলেই কী যে হয়! কে যেন কাঁদায়! মনে হয় কোথায় যেন হারিয়ে গেছি।

দূরে দূরে গৃহস্থের ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে ওঠে—সেই সুদূরাগত ধ্বনি কেমন যেন করুণ শোনায়!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাষ্টারমশাই বলেন—যা এবার বাড়ী যা গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণপক্ষের রাত, পথ ভালো নয়।

গ্রাম্য পথ সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার—কোথা থেকে আসছে শৃগালের ঐক্যতান, মাঝে মাঝে এক একটা কুকুর উঠছে ডেকে। গৌরাঙ্গ এই পথ দিয়েই ফেরে।

সত্যি সে নিজেই যেন বুঝতে পারে না, কেন তার মন মাঝে মাঝে এমন উদাস হয়ে যায়! কীর্ত্তনের সুরের মধ্যে কী মাদকতা আছে? কোন্ জাদু?

বাড়ীর কাছ বরাবর এসে পড়ার পর চোখে পড়লো বাঁড়ুয্যে বাড়ীর সামনের খোলা জমিটায় কি যেন হচ্ছে, আলোর রেখা আসছে সে দিক থেকে। কোনোমতে চারটে বাঁশের খুঁটি পুঁতে একটুখানি চাঁদোয়া টাঙিয়ে আসর খাড়া করা হয়েছে। চৌকো একটা লণ্ঠন মাঝখানে টুলের উপর বসানো ; আলোর চাইতে ধূমই উদ্‌গীরণ করছে বেশী।

ওঃ, ভাগবত পাঠ হচ্ছে। নিত্যই হয়।

বাঁড়ুয্যে গিন্নী ব্রত সারা উপলক্ষে একমাসের জন্য 'ভাগবত দিয়েছেন।' ছোট্ট আসর, বক্তাও তদুপযুক্ত। রোগা কালো শ্রীহীন ব্রাহ্মণ। শ্রোতার সংখ্যাও আশাপ্রদ নয়। নারায়ণ দর্শন উপলক্ষে চণ্ডীতলায় আনাগোনা করার হুজুগে অনেকেই কাহিল হয়ে গেছে, নেহাৎ যারা 'নিত্য ভাগবতে'র নিয়ম রাখতে চায় তারাই আসীন।

নিভাননী তাদের মধ্যে একজন।

গৌরাঙ্গ কি ভেবে সেই দিকে এগিয়ে গেলো। আসরে ঢুকলো না, দাঁড়িয়ে থাকলো একটু দূরে। পাঠকের জড়িত কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট কিছু শোনা যায় না, শুধু একঘেয়ে একটানা একটা সুর আসছে ভেসে।

এই চাঁদোয়া, এই খুঁটি, এই মৃদু আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুদূর কল্পনায় মনটা কোথায় ভেসে যায়—এই ছোট্ট আসরটা যেন বাড়তে বাড়তে বিস্তৃতি লাভ করে—বিরাট আসর—বিরাট ভীড়—লাল শালুর গায়ে 'ভবঘুরে অপেরা পার্টি'র নাম লিখে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে আসরের সামনে। মাঝখানে জম জমাট অভিনয় চলছে। ঝাপসা ঝাপসা এই দৃশ্য আবার মিলিয়ে যায়। ছোট্ট আসরটার সামনে থেকে ধীরে ধীরে সরে যায় গৌরাঙ্গ।

কেন তার এই স্বপ্ন।

কেন তার মনের মধ্যে ভীড় করতে চায় অজস্র সব চরিত্র। প্রেমে

ভোলা, ভাবে ভোলা, বীরত্বে আর মহত্বে উজ্জ্বল। সেই সব চরিত্রকে রূপ দিতে হবে—প্রাণ দিতে হবে, এ দায়িত্ব কে দিয়েছে গৌরাঙ্গকে ?

বাড়ী ঢুকতে গিয়ে দেখলো উঠোনের মাছখানে ছোটোখাটো একটী ভাঙা ইঁটের স্তূপ, বোধকরি বাদলবাবুর খেলার দুর্গ। হেঁট হয়ে ইঁটগুলো সরাতে থাকে।

ঘরের মধ্যে থেকে সুধারাণী আসছিলো একটা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে—আলোটাকে উঁচু করে ধরে উঠোনের নীচু হওয়া মানুষটাকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করে—কি খুঁজছো ওখানে ? কিছু হারালো না কি ?

গৌরাঙ্গ মৃদু হেসে বলে—হারাবার মতো জিনিষ আর আমার আছে কি সুধামুখী ? একটা মাত্র দামী জিনিষ ছিলো, সে তো অনেক দিন আগেই হারিয়ে বসে আছি।

সুধামুখী ভারী মুখে বলে—তা জানি। কোথায় হারিয়ে বসে আছো, তাও জানতে বাকী নেই।

—এই হয়েছে ! বোনকেও ভাইয়ের রোগে ধরেছে ! 'সন্দেহ' জিনিষটা বড়ো খারাপ সুধামুখী—বড়ো খারাপ। চাপা অম্বলের মতো দেহকে একেবারে জীর্ণ করে ফেলে।

এই সময় বাসন্তী বেরিয়ে আসে অন্য একটা ঘর থেকে। বেরিয়েই সুধামুখীর হাতের আলোতে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলে ওঠে—কি করলে ঠাকুরজামাই, বাদলের 'হিমালয় পাহাড়' ভেঙে দিলে ? কতো কষ্টে বেচারা উঠোনের মাঝখানে হিমালয় পাহাড় তৈরি করেছিলো, সকালে উঠে আর রক্ষে রাখবে না !

গৌরাঙ্গ সুধামুখীর হাত থেকে আলোটা নিয়ে উঠোনে চোখ বুলিয়ে দেখতে দেখতে বলে—তা' তো রাখবে না। এদিকে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ এসে অন্ধকারে হোঁচট খেলে ? বুড়ো মানুষ—বাঁচবেন তা'হলে ? ভাগবত শুনে ফেরবার সময় হয়ে এলো যে !

পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ সদর দরজার চাইতে ভিতর উঠোনের

খিড়কির দরজাই বেশী ব্যবহার হয়, কাজেই নিভাননী এই দিকেই আসবেন নিশ্চিত।

সুধামুখী স্বামীর সঙ্গে একটু প্রেমালাপের মুখেই বাসন্তীর আবির্ভাবরূপ বিঘ্নে চটে উঠেছিলো, সেই বিরক্তিকে প্রকাশ করবার আর কোন উপায় না পেয়ে, মুখ ঘুরিয়ে বলে—'শ্বাশুড়ীঠাকরুণে'র ওপর দরদ তো কতো!

—দরদ মানে? গৌরাঙ্গ অবাক সুরে বলে—তা'বলে বুড়োমানুষ হোঁচট খাবেন? ভারী অদ্ভুত কথা বলো তো!

গৌরাঙ্গর কাছে কথাটা অদ্ভুতই বৈ কি।

শুধু দরদ দিয়ে ভরা নয়, দরদ দিয়েই গড়া তার মনটা। ক্ষ্যাপায় সে সকলকেই, কিন্তু দরদ প্রত্যেকের উপরই ষোলো আনা। সাধারণতঃ ভোরবেলায় ওঠে সে, উঠে—আগেই কুয়োতলায় এসে খোঁজ নেয় জল তোলা আছে কি না। শশধর সকাল বেলাই কাছারী যায়, তাড়াতাড়ির সময় পাছে অসুবিধেয় পড়ে।

কপিকল লাগানো কুয়ো, জল তোলার শব্দে হয়তো বাসন্তী এসে তিরস্কার করে, হয়তো সুধামুখী বলে 'বাড়াবাড়ি,' গৌরাঙ্গ বলে—আপনারা বোঝেন না। তাড়াতাড়ির সময় মানুষটা চোখে কানে দেখতে পায়না, হাতের কাছে সব মজুত রাখতে হয়।

পাড়ার লোকের সঙ্গেও তার সহৃদয়তা, পথের কুকুরটা ছাগলছানাটার উপরও স্নেহ-দৃষ্টি!

পরদিন সকালে একটা ঘটনা ঘটলো।

শশধর নিজস্ব পদ্ধতিতে বাইরে সদরের দিকে দাওয়ায় নীচু জলচৌকী পেতে বসে অভিনিবেশ সহকারে দাঁতন করছিলো, দু'জন লোক অদূরে গরুর গাড়ী থেকে নেমে এসে প্রশ্ন করে—গৌরাঙ্গবাবু থাকেন এ বাড়ীতে? গৌরাঙ্গবাবু?

আধা-ভদ্রগোছ চেহারা লোক দুটোর। ঈষৎ খাটো ধুতি, হাফ্ সার্টের উপর টান্‌টান সোয়েটার পরা, চুলে বেশ লম্বা টেরী।

'গৌরাঙ্গবাবু' শুনেই শশধরের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, গম্ভীর ভাবে বলে—কি দরকার?

—আজ্ঞে যা বলবার তাকেই বলবো। ডেকে দিন একবার।

শশধর নির্বাক। বোধকরি এদের অনুরোধ রক্ষা নিষ্প্রয়োজন বোধে এমন ভাবে নিজের কাজে মন দেয়, মনে হয় সামনের জলজ্যান্ত লোক দুটোকে সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে।

শশধরের কুলকুচোর ছিটে লাগবার ভয়ে লোক দুটো সভয়ে একটু সরে গিয়ে আবার বলে—একটু ডেকে দিননা মশাই গৌরাঙ্গ বাবুকে!

দাওয়ার উপরেই যে তিনখানা ঘর, তার মধ্যে একখানা বাসন্তীর, একখানা সুধামুখীর, ছোটোখানা নিভাননীর শয়ন ঘর। বাইরের কথার আওয়াজ ঘরের ভিতর এসে পৌঁছয়।

গৌরাঙ্গ চৌকীর উপর পা ঝুলিয়ে বসে নিজস্ব ভঙ্গীতে সুর ভাঁজছিলো গুন্‌গুন্ করে, আর ছোট্ট ছোট্ট করে তাল দিচ্ছিলো ঘুমন্ত বাদলের পিঠের উপর। সুধামুখী হাই তুলতে তুলতে 'বাসিঘরে' ঝাঁটা বুলোচ্ছে। সহসা উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনে বলে—বাইরে কে ডাকছে তোমাকে!

গৌরাঙ্গ উদাস ভাবে বলে—আমাকে আর কে ডাকবে?

—মনে হচ্ছে অচেনা গলা।

গৌরাঙ্গ একই ভঙ্গীতে বলে—অচেনা গলা? চেনা গলাতেই কেউ ডাকে না সুধামুখী, তা' অচেনা।

ততোক্ষণে স্পষ্ট শোনা যায়—গৌরাঙ্গবাবু, একবার বেরিয়ে আসুন না।

—ওই শুনলে?

অগত্যা উঠতেই হয় গৌরাঙ্গকে কোঁচাটা ঝেড়ে নিয়ে, গায়ের এলোমেলো চাদরটা গুছিয়ে।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই একটা লোক দরাজ গলায় বলে ওঠে— কি মশাই, গোবর্দ্ধন অধিকারীর কাছে কি করে এসেছেন?

—গোবর্দ্ধন অধিকারীর কাছে? গৌরাঙ্গ অবহেলা ভরে বলে— কেন কি বলেছে অধিকারী?

—জানি না মশাই, আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে, চলুন।

অকস্মাৎ এহেন কথা শুনেও গৌরাঙ্গর মুখে বিশেষ গ্রাহ্যের ভাব দেখা যায় না, কিন্তু শশধর দাঁড়িয়ে উঠে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, নড়তে পারে না। কি যে করে এসেছে গৌরাঙ্গ, সে আর বুঝতে বাকী নেই তার। নিশ্চয় সেই হারমোনিয়ম। চুরির ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

গৌরাঙ্গ অগ্রাহ্যভরে বলে—ওয়ারেন্ট তো বুঝলাম, কিন্তু কি বাবদ, জানতে পারলে ভালো হতো না?

—সেখানে গিয়েই শুনবেন—লোকটা গোঁফের ফাঁকে একটু চতুর হাসি হেসে বলে—আমাদের উপর হুকুম হয়েছে—আপনাকে ধরে নিয়ে যাবার।

—হুকুমটা যদি আমি না মানি?

—তা' হলে আজ্ঞে বেঁধে নিয়ে যাবারও হুকুম আছে।

গৌরাঙ্গ দমে না, দমবার ছেলে সে নয়, এদের কথার উত্তরে বলে —একেবারে—বেঁ—ধে? তাহলে যান দড়িদড়া জোগাড় করে আসুন।—বলে ভিতরে ঢুকে যায়।

শশধর তো তার আগেই গম্‌গম্ করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে এসেছে:

সুধা উৎকণ্ঠিত ভাবে বলে—বাইরে কে ডাকতে এসেছে দাদা?

শশধর গম্ভীর ভাবে বলে—পুলিশের লোক।

—পুলিশের লোক?

সুধা আঁৎকে ওঠে।—পুলিশের লোক কেন দাদা?

—কেন? আসবে না কেন, সেইটা শুনতে পাই? চোরাই-মাল বাড়ীতে পুষে রাখলে পুলিশ আসবে না? নাও, হারমোনিয়মের গান শোনো?

সুধা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

বাসন্তী এসে দাঁড়ায় শশধরের জন্য কাচা কাপড় হাতে করে। এসে বলে—কি হলো ঠাকুরঝি, অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

—বৌদি!—সুধার কণ্ঠ রুদ্ধ!

—কি হলো কি? হ্যাঁ গো, ভাই বোনে ঝগড়া করলে না কি সকালবেলা? অমন করছো যে?

শশধর তাচ্ছিল্যভরে বলে—আমার আবার অমন করবার কি আছে? যাও আদর করে ঠাকুরজামাইকে মাছের মুড়ো খাওয়াও গে? শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। হুঁঃ, পরের হারমোনিয়ম চুরি করে এনে সখ মিটোনোর মজা টের পাবেন এইবার—

বাসন্তী তীব্র প্রতিবাদে বলে ওঠে—ছিঃ! কার নামে কি বলছো? ঠাকুরজামাই বাজনা চুরি করে এনেছে, এই কথা বলতে পারলে?

—আমার বলার দরকার কি? যাদের এনেছে তারাই ওয়ারেণ্ট দিয়ে ধরে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছে।

—আর তুমি তাই বিশ্বাস করছো?

—অবিশ্বাসেরও দেখি না কিছু।

এই সময় গৌরাঙ্গ এসে ঢুকলো।

বাসন্তী একবার ওর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বলে—কি ঠাকুরজামাই, কে ওয়ারেণ্ট এনেছে?

—গোবর্দ্ধন অধিকারীর লোক। বলে কি না এমনি না গেলে বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে। নে বাবা, আন্ তা'হলে দড়িদড়া! কথার যদি কোনো মানে থাকে!

বাসন্তী মৃদু হেসে বলে—অধিকারীকে কেৰ্ত্তন শোনাওনি তো ঠাকুরজামাই?

—কেৰ্ত্তন ? তা' শুনিয়েছিলাম বৈ কি।

—তবেই বোঝা গেছে। কেৰ্ত্তনের বায়না পাঠিয়েছে বোধ হয়।

শশধর গম্ভীর বিস্মিত দৃষ্টিতে বাসন্তীর পরিহাসদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর গৌরাঙ্গ সহসা খপ্ করে বাসন্তীর দু'পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলে ওঠে—ইস্ সাধে কি আর বলি বৌদি, বেটাছেলে হয়ে জন্মালে আপনি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হতেন! যাই দেখি—

ব্যাপারটা বাসন্তী ঠিকই ধরেছে।

পাশের গ্রাম সোনাডাঙায় জমিদার গিন্নীর ব্রত উদ্‌যাপন উৎসব, এই উপলক্ষে গোবর্দ্ধন অধিকারীর যাত্রার বায়না হয়েছে। আর গোবর্দ্ধন এদের টাকার বাহুল্য দেখে একদিন কীর্ত্তন গান শোনানোর প্ররোচনা দিয়ে খবর পাঠিয়েছে গৌরাঙ্গকে। খামখেয়ালী গৌরাঙ্গ যদি আসতে রাজী না হয়, তাই গোবর্দ্ধনের এই নীরেট রসিকতা।

ঘুরে এসে গৌরাঙ্গ হৈ হৈ করে—বৌদি বৌদি, আপনার অনুমানই সত্যি! একখুনি যেতে হবে, একেবারে গাড়ী নিয়ে হাজির। জমিদার গিন্নীর ব্রত সারা—বাড়ীর ছেলেপুলেকে নিয়ে যেতে বলছে।···বাদলা যাবি না কি ? চল্, বেরিয়ে পড়ে পথ থেকে মাষ্টারমশাইকে খবরটা দিয়ে রওনা দিই।

বাদলা তখন সবে ঘুম থেকে উঠে বসেছে, বাপের কথা শুনেই তড়াক করে চৌকী থেকে লাফ দিয়ে নেমে, একেবারে বাপের হাত ধরে বলে ওঠে—হ্যাঁ বাবা! যাবো বাবা! কোথায় যাবো আমরা ?

সুধামুখী এ প্রস্তাবে অসুখী না হলেও, মুখে বিরক্তি দেখিয়ে বলে—বাদলা আবার যাবে কি ? বড়োলোকের বাড়ী যাবার মতন ভালো জামা জুতো কি আছে ওর ?

হেসে ওঠে গৌরাঙ্গ। বলে—আরে বাবা, আমিই বা কী রাজপোষাক পরে যাচ্ছি ? আমারই তো ছেলে ? বৌদি, আপনি

দিন তো—ছেলেটাকে একটু জুৎজাৎ করে। ও আপনার ঠাকুরঝির কর্ম নয়।

বাসন্তী সহাস্যমুখে ডাকে—আয় বাদল!

আর সুধামুখী ঝট্‌কা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে অকারণে ঘরের কোণ থেকে একটা ঘড়া টেনে কাঁকালে নিয়ে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। বেরোবার সময় খানিকটা আক্রোশ প্রকাশ করে যায় বেড়ার দরজাটার উপর। সব সময় কেন তার পরাজয়? কেন সর্বদা বাসন্তীকে প্রাধান্য দেবে তারই স্বামী?

কীর্ত্তনের আসরটি সাজানো হয়েছে চমৎকার!

বনেদী বড়োলোকের বিরাট চকমিলোনো বাড়ী, মাঝখানের প্রকাণ্ড উঠোনে গালচে পেতে বসেছে আসর। চারিদিকে দালানের খিলেন, আর খিলেনের প্রত্যেকটি থামের গায়ে একখানি করে বড়ো বড়ো ছবি ঝোলানো, কৃষ্ণলীলার নানা রূপ। সব ছবিতে ফুলের মালা, উঁচুতে প্রকাণ্ড এক ঝাড়-লণ্ঠন।

উপরের চারদিক ঘেরা বারান্দায় মহিলা শ্রোতার সারি।

আসরের মাথার দিকে জলচৌকী পেতে আর একখানি পট স্থাপনা করা হয়েছে—রাধাকৃষ্ণের যুগলমুর্ত্তি! ফুলের ভারে ছবিখানি প্রায় ঢাকা। দু' পাশে ধূপদানীতে জ্বেলে দেওয়া হয়েছে এক গোছা করে ধূপ। ধূপের গন্ধে, আর ফুলের গন্ধে সমস্ত জায়গাটা যেন হৃদয়ভারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে।

বাদলও বোধকরি হৃদয়ভারে মুর্চ্ছিত।

এতো ফুল, এতো আলো, এতো শোভা! এইখানে আসতে বারণ করছিলো মা ভালো জামা জুতো নেই বলে! তুচ্ছ জামা জুতো!

এরপর যখন খোলের বাদ্য উঠলো, আর গৌরাঙ্গ আসরে এসে সুর ধরলো, তখন আর বাদলের বাহ্যজ্ঞান নেই।

এই অপূর্ব মুর্ত্তি! এ কি না বাদলের বাবা!

খালি গা, কপালে চন্দন মাখা, গলায় গোড়েমালা, পাতলা উড়ুনী একখানা আলতো করে গায়ে জড়ানো, হাত নাড়ার তালে তালে উড়ুনী খসে খসে পড়ছে। ঝাড় লণ্ঠনের সমস্তটা আলো বুঝি তারই গায়ে মুখে এসে পড়েছে।

সবটা মিলিয়ে যেন একটা লোকাতীত রূপ!

বাপের রূপে মোহিত হয়ে যায় বাদল, অকারণে বারেবারে তার চোখে জল আসে। ওই অলৌকিক ব্যক্তি তারই বাবা, এ বিশ্বাসের জোর মনের মধ্যে খুঁজে পায় না। নিজেকে ভারী অকিঞ্চিতকর মনে হয় বাদলের।

—

তবু ঘুম এসে যায়।

বারেবারে রগড়ে রগড়েও চোখকে আয়ত্তে রাখতে পারে না। মনের মধ্যে যতোই আগ্রহ আকুলতা থাক, দেহটা শিশুর বৈ তো নয়। বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে এক সময় গুটিয়ে সুটিয়ে শুয়ে পড়ে। পাশের ব্যক্তি বিরক্তচিত্তে হাঁটুটা একটু সঙ্কুচিত করে সামান্য জায়গা ছেড়ে দেন।

দোতলার দালানে আরও দুটি বিস্ফারিত চক্ষু বাদলের মতোই মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব সঙ্গীতময় মুর্ত্তিখানির দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে ছিলো। বোধকরি তারও বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এ কি শুধুই কীর্ত্তন গায়ক? না স্বয়ং নদের গোরা?

নাম শুনেছিলো 'গৌরাঙ্গ', নামের এমন সার্থকতা অপর্ণা কি আর কখনো দেখেছে?

অপর্ণার মনের কথারই প্রতিধ্বনি উঠেছে সমগ্র নারী মণ্ডলীর মধ্যে।

'আহা হা, কী রূপ রে, যেন সত্যিকার গৌরাঙ্গ! 'সার্থক নাম রেখেছিলো মা বাপ!' 'কী গানই গাইছে, মরি মরি! ভক্তের

মুখের কৃষ্ণনাম! এর মহিমাই আলাদা!' 'এমন মধুর গলা, বড় একটা শোনা যায় না।'

বহু রমণীরই কণ্ঠরুদ্ধ, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত।

শুধু অপর্ণাই নীরব।

তার সংকল্প আলাদা। সে ভাবতে থাকে, একবার দেখা করা যায় না? একবার গিয়ে নিজে মুখে প্রশংসা করা যায় না? বোঝানো যায় না—তোমার রূপে, আর তোমার গানে কী আনন্দের সঞ্চার করেছো তুমি অপর্ণার প্রাণে!

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব!

ক্রমশঃ···গান শেষ হয়, বাতাসার থালা হাতে পূজারী ব্রাহ্মণ মাঝখানে এসে হরির লুঠ ছড়াতে সুরু করেন। মুঠো মুঠো বাতাসা ভীড়ের মাঝখানে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে উপরের মহিলাদের দিকে—ধূম পড়ে যায় কাড়াকাড়ির।

অতঃপর সবাইয়ের ঘরে ফেরবার পালা।

যে যার ঘুমন্ত এবং জাগন্ত ছেলেমেয়েকে টেনে তুলে রওনা দেয়!

অতো বড়ো আসর খালি হয়ে যায়—খালি হয়ে যায় মহিলা অধিকৃত চকমিলোনো বিরাট বারান্দা।

শুধু শূন্য আসরের এক কোণে গুটি সুটি মেরে পড়ে থাকে ঘুমন্ত বাদল, আর উপরে শূন্য বারান্দার জাফ্‌রী ধরে দাঁড়িয়ে থাকে অপর্ণা!

ওরই মাঝখানে দুটো চাকর আসে সতরঞ্চ গুটিয়ে তুলতে। খানিকটা গুটিয়ে ফেলে একে অপরকে বলে—আরে এ ছোঁড়াটা আবার কে? কেউ ফেলে রেখে গেলো না কি?

অপর ব্যক্তি ঠেলা দেয়—এই খোকা ওঠ! ওঠ! এই খোকা!

খোকা তো ঘুমিয়ে কাদা!

ঠেলাঠেলিতে মুখটা ঘুরে আসে আলোর দিকে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে—আরে এ যে কীর্ত্তুনী ঠাকুরের ছেলে। সকালে দেখেছি সঙ্গে এসেছিলো—

শেষ কথাটা শোনার আগেই চমকে উঠেছিলো অপর্ণা!

'কীর্ত্তুনী ঠাকুরের ছেলে!' এই কথাটা ধাক্কা দিয়েছে শুধু কানের পর্দ্দায় নয়, মনেরও পর্দ্দায়।

মুহূর্ত্তে তরতর করে নেমে এসে চাকরটাকে উদ্দেশ করে বলে—কিরে বাপু, ছেলেটাকে সুদ্ধু সতরঞ্চ গুটোবি না কি?

—কি করি দিদিমণি, এ যে একেবারে ঘুমিয়ে কাদা!

—তার আর আশ্চয্যি কি? কচি বাচ্ছা! নে তুলে নিয়ে আয় দিকিন ভেতর বাড়ীতে, বিছানায় শুইয়ে দিবি চল্!

চাকরটা বাদলকে পাঁজাকোলা করে তুলে বলে—আজ্ঞে দিদিমণি এ হচ্ছে কীর্ত্তুনী ঠাকুরের ছেলে!

—বেশ তো! ছেলেকে যেখানে সেখানে ফেলে রেখে যে ভুলে চলে যায়, তার তো শাস্তি হওয়াই উচিত! কাউকে বলবি না খবরদার! খুঁজুক ঠাকুর ছেলেকে!

গৌরাঙ্গকে অধিকারীর দলের সঙ্গে ঠেলে নিয়ে গেছে বারবাড়ীতে।

খানিকটা হট্টগোলের পর গৌরাঙ্গ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে—আমার ছেলেটা?

ছেলেটা!

তাইতো! কোথায় সে! সকলেই এদিক ওদিক তাকায়।

গৌরাঙ্গ ফরাসে বসে একখানা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের ভঙ্গীতে বলে—দেখুন কেউ আবার নিজের মোট গুণতে ভুল করে একটা বাড়তি নিয়ে গেলো না তো?

দু' একজন হাসে, কিন্তু কেউ বলতে পারে না গেলো কোথায়! গৌরাঙ্গই আবার চিন্তিত মুখে 'তাই তো'—বলে উঠে পড়ে।

এহেন সময় একটা দাসী এসে বলে—ও অধিকারী মশাই, শুনছেন ? কারুর ছেলে হারিয়েছে ?

গোবর্দ্ধন চমকে বলে—ছেলে ? এঁ্যা ! পাওয়া গেছে না কি ? হয়েছে ! গৌরাঙ্গ, ভাবনা ঘুচেছে !...এই যে এর ছেলে !

গৌরাঙ্গ সন্দিগ্ধভাবে বলে—কেমন দেখতে ছেলেটি ?

দাসীটা বেজার মুখে বলে—গিয়ে দেখবে চলো না ঠাকুর ! গিন্নীমা বলে পাঠালো !

গিন্নীমা !

অধিকারী তটস্থ ভাবে বলে—যাও হে গৌরাঙ্গ, যাও যাও ! মাঠাকরুণ স্মরণ করেছেন !

অন্তঃপুরে ঢুকে গৌরাঙ্গ যেন অথই জলে পড়লো। সে এসেছিলো নিজের ছেলে দেখতে, অন্তঃপুরের অন্তর্লোক যে তাকে দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, একথা গৌরাঙ্গর কল্পনাতেও আসার কথা নয়।

একে সেই অপূর্ব কীর্ত্তন গানের গায়ক, তার উপর আবার জাতিতে ব্রাহ্মণ, এতে মহিলা সমাজ একবার তাকে ভক্তি নিবেদন না করে পারে কি করে ? আবার শুধু ভক্তি নিবেদন করে ক্ষান্ত হবার পাত্রী তাঁরা নয়, নৈবেদ্যও নিবেদন না করে ছাড়বেন না তাঁরা।

অন্তঃপুরে বসে জলযোগ করে যেতে হবে গৌরাঙ্গকে !

গৌরাঙ্গ কাতর বিপন্নমুখে বলে—এ সব থাক, এ সব থাক, খাওয়া দাওয়া বাইরে সবাইয়ের সঙ্গে হবে অখন, আমি যাই।

গৌরাঙ্গ প্রায় ফেরার চেষ্টাই করে, ঠিক এই সময় পাশের ঘরের একটা দরজার কাছ থেকে কে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে বলে—ভয় পেয়ে পালাচ্ছেন ঠাকুর ? বেশ তো ? ছেলে চিনতে এসেছিলেন না ?

চমকে তাকিয়ে দেখে গৌরাঙ্গ।

কালো ফিতে পাড় শাড়ী পরণে, আলগা এলো খোঁপা ঘাড়ে,

আঁটসাঁট গড়নে আঁটসাঁট সাদা ব্লাউস পরা মাজাঘসা একটি তরুণী বিধবা।

গৌরাঙ্গ একবার ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে—ও আর দেখতে হবে না। ভালো জায়গায় আশ্রয় পেয়েছে, সুখে নিদ্রা যাবে। আমি যাই—

কিন্তু যাওয়া তার হয় না।

স্বয়ং কর্ত্রী এসে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছেন। নিজস্ব রাশভারী চালে তিনি বলেন—যাই বললে চলবে না বাছা, খেয়ে যেতে হবে। বামুনের ছেলে খাওয়ায় না করতে নেই! এরা সব আগ্রহ করে গুছিয়ে রেখেছে! আহা, খাসা গান শুনিয়েছো বাছা, শুনে বড়ো তৃপ্তি পেয়েছি। আর দু'দিন থাকতে হবে বাপু, সব্বাই বলছে! নাও একটু ফল জল মুখে দিয়ে নাও।

গৃহিণীজনোচিত কর্ত্তব্য সেরে গৃহিণী প্রস্থান করেন। আপত্তির অবসর না দিয়ে 'চারু' ঝি গৌরাঙ্গকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই সাজানো পাতের সামনে নিয়ে যায়। আশেপাশে অবগুণ্ঠিতা, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, অনবগুণ্ঠিতা নারী বাহিনী।

গৌরাঙ্গের তো চক্ষুস্থির!

এদের সামনে বসে খেতে হবে? আর খেতে হবে এই ক্ষীর ছানা মাখন মিশ্রী ফল সববৎ দই মিষ্টির সম্ভার?

—মাপ করতে হবে—আমি এ সব—মানে আমার দ্বারা এতো সব—ইয়ে আমি যাই।

আবার একটা সুরেলা হাসির ঝঙ্কার—ঠাকুর কি কেবল ওই একটা কথাই শিখে রেখেছেন না কি? 'আমি যাই'! গৌরাঙ্গর সুরের নকল করে আর একবার হেসে ওঠে সে!

অপর্ণার কাছ থেকে এতোটা বাচালতা বোধহয় উপস্থিত সকলের কাছে অপ্রত্যাশিত। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে বিরূপ ভঙ্গীতে।

সহসা ঋজু হয়ে দাঁড়ায় গৌরাঙ্গ, দৃঢ় ভাবে বলে—দেখুন খাওয়াতে ইচ্ছে হয়, বাইরে পাঠিয়ে দেবেন, সদ্ব্যবহার করে ফেলবার লোকের অভাব হবে না। আমায় ছেড়ে দিন দয়া করে, আমার এসব ভালো লাগছে না!

এ কথার প্রতিক্রিয়া আর কোথায় কি হয় কে জানে, একখানি হাস্যোজ্জ্বল মুখ দপ্‌ করে যেন নিভে গেলো, সেইটুকু স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

—বেশ তা'হলে যান! সেই নিভে যাওয়া মুখ থেকে উচ্চারিত হয়—চারু, ঠাকুরমশাইকে বাইরে নিয়ে যাও, আর খাবারটাও বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করো! কিন্তু ঠাকুর, একবার নিঃসন্দেহ হয়ে যান। দেখে যান ছেলেটাকে?

ছেলেটা!

গৌরাঙ্গ এবার আর এ অনুরোধ এড়াতে পারে না, অনেকক্ষণ না দেখে স্বস্তি নেই প্রাণে। ইতস্ততঃ করে এদিক ওদিক চেয়ে বলে—কই কোথায়?

—আসুন—বলে দেয়ালের কাছে বসিয়ে রাখা একটা হ্যারিকেনের আলো খপ্‌ করে তুলে নিয়ে অপর্ণা পথ দেখিয়ে ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়।

গৌরাঙ্গ যেন প্রায় অজ্ঞাতসারেই তার অনুসরণ করে।

ওদের চেহারা দুটো চোখের আড়াল হতেই উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে কলগুঞ্জন ওঠে—'দেখলে দিদি, ঢং দেখলে?' 'দেখলাম বৈ কি দিদি! ভগবান যখন কপালের ওপর চক্ষু দুটো দিয়েছেন, সবই দেখতে হবে!'

'এ না কি গিন্নীর বুন্‌ঝি ভাই, আমাদের হলে আর রক্ষে থাকতো না! বিধবা ছুঁড়ির হাসি দেখলে তো? গা যেন জ্বলে গেলো!'

বলা বাহুল্য সমালোচিকারা 'ছুঁড়ি' না হলেও বিধবা অনেকেই।

বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যে আবার পক্ষ সমর্থকও খুঁজে পাওয়া যায় এক আধজন, একটি সধবা মহিলা বলেন—'তোমাদেরও ভাই অন্যায় কথা, বিধবা হয়েছে বলে সে আর জন্মে কখনো হাসবে না?

একজন উদাসীন ভাবে বলেন 'হাসবে না কেন? জন্ম জন্ম হাসুক! তবে একেই বিধবা মানুষের অতো 'ভাবন' 'ফ্যাসান' শাড়ী চুড়ি, চুলের বাহার, এই সব দেখলেই গা কেমন করে, তার ওপর আবার ওই বেহায়া হাসি। ছিঃ!'

সহানুভূতিশীলা বলেন—'তা হলে পষ্ট কথা বলি ভাই, 'স্বামী গেছে' বলে যৌবনে যোগিনী সাজবে, তেমনি স্বামীই কি ছিলো ওর? মরেছে—না ছুঁড়ির হাড় জুড়িয়েছে! কী গুণের গুণনিধিই ছিলো! বড়োলোকের ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলো মা বাপ, রূপও ছিলো জামাইয়ের, কিন্তু হলে কি হবে, একেবারে মাকাল ফল! শুনেছি বারোবছর বয়েস থেকেই না কি পাঁড় মাতাল, আর অকথ্য স্বভাব! যতো দিন বেঁচেছিলো, ছুঁড়িকে মেরে মেরে হাড় গুঁড়িয়েছে!'

অবশ্য এতো বড়ো বক্তৃতাতেও অপরাদের মন ভেজে না, তাঁরা মুখ বাঁকিয়ে বলেন—'সে দিদি, যার যা কর্ম্মফল! তা বলে—বিধবা, বিধবার মতন আচরণ করবে না? না না, ও মেয়ে বড্ডো বাচাল! হয়েছেও তেমনি, শ্বশুরকুলের অতো ঐশ্বয্যি, অতো পয়সা, ওই তো একা সর্বেশ্বর মালিক। শাশুড়ী বুড়ি ছিলো এ যাবৎ, সেও শুনছি মরেছে! কাজেই ইনিও সাপের পাঁচ পা দেখেছেন! গিন্নীর বুনঝি, তাই—সাতখুন মাপ! গিন্নী যে একেবারে 'অপর্ণা' বলতে অজ্ঞান!

যার সাতখুন মাপ, সে তখন অনায়াস লীলায় চলেছে আলো ধরে পিছনে একটা নিরুপায় জীবকে টেনে নিয়ে।

বড়োলোকের তিন মহলা বাড়ী, কতো ঘর কতো দালান, কত বারান্দা!

অনেকগুলো ঘর বারান্দা পার হয়ে একটা মাঝারি মতো ঘরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে অপর্ণা।

ধবধবে বিছানায় ধবধবে মশারী ফেলা। মশারীর ঝালরের একটা কোণ উঁচু করে তুলে ধরে অপর্ণা মুখ টিপে হেসে বলে—দেখুন, নিজের জিনিষ চিনে নিন!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে! রাজসৈ বিছানায় শুয়ে তোফা ঘুমোচ্ছে বেটা। চলুন!

অপর্ণা তেমনি মুখটিপে হেসে বলে—আর যাবো কেন? পথ চিনিয়ে তো নিয়ে এলাম, এবার নিজে চিনে চলে যান?

গৌরাঙ্গ সচকিত দৃষ্টিতে একবার চারিদিক তাকিয়ে বলে—নিজে চিনে! তাহলেই হয়েছে! তা'হলে সারারাত্তির গোলক ধাঁধাঁয় পথ হারিয়ে মরতে হবে! যা 'পেল্লায়' বাড়ী।

অপর্ণা একবার স্থির দৃষ্টি তুলে গৌরাঙ্গর সরল সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—না গোলকধাঁধাঁয় পথ হারাবেন না, সে লোক আপনি নন। চলুন! ছেলেকে কাল সকালে খাইয়ে দাইয়ে তবে ছাড়া হবে। বামুনের ছেলে রাত উপোসী হয়ে রইলো!

বেলা অবধি ঘুমের আয়েসের অভ্যাস থাকলেও অপরিচিত জায়গায় ভোর বেলাই ঘুম ভেঙে গেলো বাদলের। ধড়মড় করে উঠে বিছানা থেকে নেমেই যেন হতভম্ব হয়ে গেলো।

অপর্ণা তখন স্নান সেরে এসে চুল আঁচড়াচ্ছিলো, ওর অবস্থা দেখে মুখ টিপে টিপে হাসে, কথা বলে না।

—বাবার কাছে যাবো—কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে ওঠে বাদল।

অপর্ণা কাছে সরে এসে হাসি হাসি মুখে ওর চিবুকটা ধরে তুলে বলে—বাবার কাছে তো' যাবে, কার ছেলে তুমি তাই শুনি?

—আহা! জানো না! যিনি কাল গান গাইলো। ওই—উনিই তো আমার বাবা!

—ওমা তাই বুঝি? তা আচ্ছা বাবা তো তোমার? ছেলে হারিয়ে ছেলের খোঁজ নেই! বোকা বাবা!

—ঈস! তাই বৈ কি, আমার বাবা খুব ভালো! কী সুন্দর গান করেন!

অপর্ণা কাছে বসে পড়ে ওর পিঠটা ধরে কাছে টেনে বলে—তাহলে তোমার বাবাকে একবার ডেকে আনো না, সুন্দর গান আর একবার শুনি!

বাদল মহোৎসাহে উঠে বলে—বাবা কই?

—হচ্ছে হচ্ছে, বাবার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি! তবে কিন্তু আমাকে গান শোনাতে হবে? নইলে বাবার কাছে যেতে দেবো না।

—আঃ নিয়েই চলো না আমাকে, কতো গান শুনতে চাও? গাদা গাদা গান জানে বাবা।

—আর তুমি জানো না?

বাদল লজ্জার অভিনয়ে মুখ হেঁট করে বলে—'য্যাঃ'!

কিছুক্ষণ পরে একটা দাসীর পিছু পিছু বাদল বাবার কাছে এসে পৌঁছয়।

এ দিকটা বাবুবাড়ীর বাগান!

ঘুরে ঘুরে ফুল গাছগুলো দেখে বেড়াচ্ছিলো গৌরাঙ্গ। নিত্য দেবসেবার বাড়ী, তাই নানাবিধ ফুলগাছের সংগ্রহ আছে বাড়ীর বাগানেই।

বাবাকে দেখতে পেয়েই বাদল পথ পদর্শনকারিণীর সঙ্গ ত্যাগ করে ছুটে এসে বলে—বাবা! বাবা! মাসীমা তোমার গান শুনবে! চলো!

—মাসীমা? গৌরাঙ্গ অদূরবর্ত্তিনী দাসীটার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—মাসীমা আবার কে রে বাদল?

—ওই যে 'যিনি'র বিছানায় শুয়েছিলাম আমি! কতো আদর করলো, রসগোল্লা দিলো—

গৌরাঙ্গ হেসে উঠে বলে—রসগোল্লা দিলো? তবে তো একেবারে আসল মাসী!

—হুঁ! চলো না গান গাইবে—বাবার হাত ধরে আকর্ষণ করে বাদল।

ইত্যবসরে দাসীটাও এগিয়ে এসেছে। সে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হাত জোড় করে বলে—ঠাকুরমশাই, একবার ভেতর মহলে যেতে হয় আজ্ঞে—

—ভেতর বাড়ীতে? কেন?

—বাঃ মাসী যে তোমার গান শুনবে—বাদল বলে ওঠে।

দাসীটাও বলে—অপন্না দিদিমণি বলে পাঠালো আজ্ঞে, দুটো গান শোনাতে হবে।

গৌরাঙ্গ বিপন্নভাবে বলে—আহা আমি তো আর আজই চলে যাচ্ছি না? রাত্রে তো আবার আসর বসবে।

দাসীটা বিনয়ে গলে পড়ে বলে—আজ্ঞে সে যখন বসবে তখন বসবে, আপনি 'অনুগ্‌গেরো' করে এখন একবার চলো! দিদিমণির নজর উঁচু, নিয্যস্ আলাদা বকশিশ করবে! আমাদের কতো করে!

মুহূর্ত্তের জন্য গৌরাঙ্গর মুখে একটা অবহেলার হাসি খেলে যায়। তারপর ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলে—তুমি বলে দাও গে বাছা, বকশিশ দিলেই যে গান বেরোয়, তেমন গান আমার জানা নেই।

দাসীটা বোধহয় বোকা বামুনের এই নীরেট বোকামী দেখে হতাশ হয়েই চলে যায় একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে। সে তো নিজের চোক্ষেই দেখেছে, অপন্না দিদিমণি একটা বোষ্টম ভিখিরি দেখলেও তাকে কাছে বসিয়ে গান শুনে হয়তো নগদ আস্ত টাকাই বকশিশ দিয়ে বসে। 'গান' বলে মরে যায়!

দাসীটা প্রস্থান করলে বাদল ম্লান মুখে বলে—মাসী কেমন গান শুনতে ভালোবাসে বাবা! ওই গান শুনতে পেলে খেতেও চায় না, ঘুমোতেও চায় না।

—ওরে বাবা। তাই বুঝি? তা সন্ধ্যেবেলা আবার তো সে গান হবে রে।

—মাসী বলে, একলা একলা শুনতেই বেশী ভালো লাগে।

বেশী ভালো লাগবার দরকার কি রে বাপু—বলেই শিশুস্বভাব গৌরাঙ্গ প্রায় চীৎকার করে ওঠে—এই দেখ্ দেখ্ বাদল, কী প্রকাণ্ড একটা প্রজাপতি—

—কই বাবা, কই? ওই যে—ওই যে—

পিতা পুত্র দু'জনেই প্রজাপতিটার পিছনে ছোটে, আর সহসা একজনের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেতে খেতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

দুঃসাহসিকা অপর্ণা বাগানের ভিতর দিয়ে নিজেই এসেছে হানা দিতে। ওদের থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখেই একদফা খিলখিল হাসি জুড়ে দিয়ে বলে ওঠে—ঠাকুরমশাইয়ের যে সব বিদ্যেই আছে দেখছি, লাফালাফিও পারেন।

—আমরা প্রজাপতি ধরছিলাম—বাদল গম্ভীরভাবে বলে।

অপর্ণা একবার তাকিয়ে দেখে।

রাত্রে এক দিব্য রূপ দেখেছিলো গানের আসরে, এখন আর এক রূপ। সদ্যস্নাত ব্রাহ্মণ, ভিজে চুলের উপর সকালের আলো এসে পড়েছে, খালি গায়ে উত্তরীয় জড়ানো। একবার দেখে আশ মেটে না, বারবার দেখতে ইচ্ছে করে!

তাকিয়ে দেখতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ে যায়, মুখ নামিয়ে বলে—গান শোনাতে বাধা কিসের?

গৌরাঙ্গ এই প্রগল্‌ভার কথার ঠিক মতো উত্তর খুঁজে পায় না, বলে—শুনলেন তো কাল!

—শুনেচি বলেই তো আবার শোনবার বাসনা। কালকের সেই গানখানি একলা বসে শোনবার বড়ো সাধ হয়েছে!

গৌরাঙ্গ সচকিতে বলে—কোন্ গানটা?

—সেই যে—'নব অনুরাগিণী রাধা,
কিছু নাহি মানয়ে বাধা—'

—একলা গান জমে না—উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলে গৌরাঙ্গ।

অপর্ণা যেন নিভে যায়।

এই গায়ক ব্রাহ্মণ যে অনুরোধে উপরোধে টলবে, সে ভরসা খুঁজে পায় না। অতঃপর হাত বাড়িয়ে বাদলের মাথায় একটা হাত রেখে বলে—বেশ আর একটা অনুরোধ করবো—

—কি ?

—যে দু'দিন বাদল থাকবে, আমার কাছেই থাকবে।

—এই কথা! থাকুক না! আপনি তো শুনলাম ওর মাসী হয়েছেন!

—তা' হয়েছি! আরও একটা কথা—যাত্রা কীর্ত্তন ভালো লাগলে 'প্যালা' দেওয়ার একটা রীতি আছে জানেন তো? কাল দিতে পারিনি লোকের ভীড়ে হারিয়ে যাবে বলে, আজ দিতে এসেছি, নিন জয়মাল্য—বলেই সহসা নিজের গলার ছোট্ট পদক দেওয়া সরু চেন্ হারটুকু খুলতে উদ্যত হয় অপর্ণা।

গৌরাঙ্গ প্রায় শিউরে উঠে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দৃঢ় স্বরে বলে —'প্যালা' নেয় তারা, গান যাদের পেশা। আমার তো তা নয়।

—বেশ তো, না হয় নেশাই হলো! কিন্তু খুশি হয়ে গলার হার খুলে দিলে, সেটা ফেরৎ দেওয়া অপমান করা তা জানেন ?

—না, এতো কথা আমি জানি না।...বাদল, তুই তাহলে ভেতরে যা।—বলে নিজেই পিছন ফেরে গৌরাঙ্গ।

কিন্তু আবার পিছনে ডাক পড়ে—অতো ভয় কেন? কেউ তো ফাঁসি দিচ্ছে না? দাঁড়ান, বলছি—সখের গাইয়েরা না হয় বকশিশ নেয় না, কিন্তু ছোটরা মাসী পিসির কাছে উপহার নেয় তো? বাদলের আমি মাসী হয়েছি, তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বাদলকে খেলনা কিনে দিতে ইচ্ছে আমার! এখানে তো কিছু মেলে না, আমার হয়ে পরে

কিনে দেবেন ওকে—বলে হাতের মুঠোয় চাপা ছু'খানা দশটাকার নোট এগিয়ে দেয় অপর্ণা।

সরলপ্রাণ গৌরাঙ্গরও মুখটা ঈষৎ কঠিন হয়ে ওঠে, সে আগের চাইতে আরও দৃঢ়স্বরে বলে—আমাদের বাস্থুলপুরেও কিছু মেলে না, টাকা নিয়ে কী হবে?

—বেশ তো, খেলনা না মেলে খাবার কিনে দেবেন—বলে নোট ছু'খানা বাদলের হাতেই গুঁজে দিতে চায় অপর্ণা। কিন্তু বাদল চালাক ছেলে, সে এ ব্যাপারের আভাসমাত্রেই ছুই হাত মুঠো বন্ধ করে বাপের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

—বেশ বাদল, আড়ি তো? অপর্ণা ম্লান মুখে বলে।

গৌরাঙ্গ কারো ম্লান মুখ দেখতে পারে না, বিচলিত ভাবে বলে—না না, ও কথা কেন? আড়ি কিসের? বাদলকে আপনি ভালো বেসেছেন। যা রে বাদল, তবে টাকা ফাকা দেবেন না। টাকা ফাকা দেবেন না।

বাদলকে বাড়ীর ভেতর ঠেলে দিয়ে গৌরাঙ্গ বেরিয়ে পড়েছিলো, সোনাডাঙা গ্রামটা দেখে নিতে। সকলকে সে ভালোবাসে, মানুষ মাত্রেই তার ভালোবাসার বস্তু, কিন্তু নিঃসঙ্গতাও তার বড়ো প্রিয়।

উদ্দেশ্যহীন একা একা ঘুরে বেড়াতে তার ভারী ভালো লাগে। বেরোবার সময় গোবর্দ্ধন বলেছিলো—'একা যাচ্ছো কোথায় হে? পথ ঘাট চেনোনা এখানের—'

'—পথঘাট?' ও তো বেরোলেই চেনা! অভ্যস্তভাবে এক লাইন গানও গেয়ে উঠেছিলো সে, 'এসেছি একলা যেতে হবে একলা, সঙ্গে তো কেউ যাবে না।'

কিন্তু আজ যেন অশান্তির গ্রহ ওর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরতি মুখে চোখে পড়লো একটি দেব মন্দির। জমিদার গৃহিণীরই প্রতিষ্ঠিত 'যুগল মুর্ত্তির' মন্দির।

মন্দিরের উদ্দেশে একবার হাত জোড় করে খানিকটা এগিয়েই কী ভেবে আবার ফিরে এসে ঢুকলো মন্দিরে, আর যেই প্রণাম করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, দেখে সিঁড়ির গোড়ায় বাদল আর অপর্ণা।

ধাক্কা লাগছিলো আর কি।

বাদল উচ্ছ্বসিত স্বরে ডেকে ওঠে—বাবা।

এখন আর জোরে হাসে না অপর্ণা, মুখটিপে হেসে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলে—একদিনে দু'বার ধাক্কা খেতে খেতে রক্ষে! কি? বিগ্রহ দেখতে এসেছিলেন?

—হুঁ! বলে আর দুপৈঁঠে নামলো গৌরাঙ্গ, আর সেই সময় বাদল বলে উঠলো—মাসী তোমার জন্যে চিঠি লিখছিলো বাবা—

—চিঠি!

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলে—বাদলের কথা বাদ দিন, বলছিলাম—মাস দুই পরে আমার শাশুড়ীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ, সেই উপলক্ষ্যে যদি দয়া করে আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেন! দেবেন তো?

গৌরাঙ্গরও বিরক্তি আছে! সে বিরক্তি বিব্রত কণ্ঠে বলে—দু'মাস পরের কথা এখন কি করে বলি? আমি ভবঘুরে মানুষ, আমার কথা ছেড়ে দিন। সরুন যাই!

গোবর্দ্ধন অধিকারী সংকল্প শুনে 'হায়' 'হায়' করে বলে—চলে যাবে কি হে? আরও দু'দিন তোমার গান শুনবে বলে গাঁয়ের লোক 'আশ্বাস' হয়ে রয়েছে—

—শরীরটা ভালো ঠেকছে না অধিকারী মশাই!

—ও কিছু নয়! রাতে বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে। কসে আদা মরিচ দিয়ে খানিক চা খেয়ে নাও, গা ঝরঝরে হয়ে যাবে!

—না অধিকারী মশাই, মন মেজাজ যখন একবার বিগড়েছে, গান আর হবে না।

অধিকারী আর বেশী উপরোধ করে না।

গৌরাঙ্গকে সে চেনে। জানে—ওকে বাঁধা যায় না।

ফেরার প্রস্তাবে বাদল অবশ্য খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়। কারণ তার জীবনে এমন সমারোহের আস্বাদ এই প্রথম। আবার ভাবছে, হয়তো এইই শেষ!

বাদলের জীবনে কি কখনো ঘটবে এতো বৈচিত্র্যের সমাবেশ?

যান বলতে গোযান! গরুর গাড়ী।

গাড়ীতে উঠে গৌরাঙ্গ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ছেলেকে প্রশ্ন করে—তোর বুঝি থাকতে ইচ্ছে করছিলো রে বাদল?

বাদলের অভিমান ঘনীভূত হয়ে আসে। কথা কয় না।

—যেখানে সেখানে বেশী দিন থাকতে নেই বুঝলি?

বাদল তীব্র অভিমানের সুরে বলে—আমি তো থাকতে চাইনি!

—চাসনি, ইচ্ছে করছিলো তো?

—ইচ্ছেটা তো তুমি চক্ষে দেখতে পাচ্ছো না?

বাবার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে বাদল।

গৌরাঙ্গ হেসে উঠে বলে—চক্ষে আবার দেখতে পাচ্ছি না? খুব পাচ্ছি। তোর মুখে লেখা রয়েছে যে! তোর ইচ্ছে করছে—(ক্ষ্যাপানোর সুরে বলে গৌরাঙ্গ) 'নতুন মাসীর কাছে আরো অনেক দিন থাকি, পেট ভরে রসগোল্লা খাই—'

এতো অপমান সহ্য করতে বাদল রাজী নয়, ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রতিবাদ করে—কক্‌খনো না! আমি অতো হ্যাংলা নই। তা'হলে মাসীর মালাটা নিলাম না কেন?

—কোন্ মালাটা রে? বিস্মিত প্রশ্ন করে গৌরাঙ্গ।

—যে মালাটা তোমাকে 'পেরাইজ' দিতে চাইছিলো মাসী! ওর মধ্যে মাসীর 'ফটক' আছে! আমাকে পরিয়ে দিতে ক'তো সাধলো, আমি নিলাম না!

গৌরাঙ্গ হাসি গোপন করে আরো রাগায় ছেলেকে। —কেন নিলি না কেন? বেশ, তোর একটা গয়না হতো!

—ঈস! নেবে বৈ কি! 'নিজের বেলায় আঁটি সুঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি!' তুমি নিলে না, আমি নেবো কেন? বললাম —'নিলে বাবা মেরে পিঠ ভেঙে দেবে।'

—বললি এই কথা? আমি মারি তোকে?—গৌরাঙ্গর চোখ গোল হয়ে ওঠে।

—চালাকী করে বললাম—ম্রিয়মাণ ভাবে বলে বাদল—নইলে যে ছাড়ছিলো না!

—তোর পিঠ ভাঙাই উচিত!

এবার ঘুরে বসার পালা বাপের।

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেছে, তবু রোদের তেজ সমান প্রখর। রোদের আঁচ লাগবার ভয়ে 'ছইয়ের' ভিতর দিকে ঢুকে বসেছে ওরা। মেঠো পথ দিয়ে চলেছে গাড়ীখানা, ছায়া ফেলে ফেলে।

বেশ খানিকটা যাবার পর একটা মুনিষ ছোকরা ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ী ধরলো।

গৌরাঙ্গ মুখ বাড়িয়ে বলে—কি হলো?

—আজ্ঞে ঠাকুরমশাই, অপূন্নো দিদিমণি আপনার জন্যে আর খোকার জন্যে রাধাগোবিন্দর পেসাদী মালা দু'গাছা থুয়েছিলো, তাই পেইঠে দিলো। আর এই পত্তর—

কথার শেষে হাঁপাতে থাকে ছেলেটা।

কলাপাতায় মোড়া দু'গাছি গোড়ে মালা। টাটকা ভারী ভারী।

চিঠিখানা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরে গৌরাঙ্গ। একছত্র লেখা—

'ডাকবার সাহস নেই, যদি কখনো দরকার পড়ে
মনে রাখবেন। ঠিকানা রইলো নীচে।

বাদলের মাসী।'

নীচের ঠিকানা লেখা—

অপর্ণা ঘোষ

'শরৎ ভবন', ত্রিবেণী।

—উত্তর দেবেন?—ছেলেটা প্রশ্ন করে।

—নাঃ! তুমি যাও। বলে কাগজটা হাতের মধ্যে মুড়ে রাখে গৌরাঙ্গ। আর আবার গাড়ী চলতে সুরু করলে সেটা অন্যমনস্ক ভাবে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে হাওয়ার মুখে দেয়।

কাগজের টুকরো, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে একখানা একখানা করে।

বাদল তখন সেই ফিরতিমুখো ছেলেটার ছুটন্ত মুর্ত্তির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তার মাসীর পত্তরের এই দুর্গতি দেখতে পেলো না।

রোদ কমতে কমতে ক্রমশঃ বেলা পড়ন্ত হয়ে আসে। বাতাস স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। গাড়ীখানা এগিয়ে চলে কখনো শুধু তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া খোলা মেঠোপথ দিয়ে, কখনো বা সরু রাস্তার দু'পাশে ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে।

গাছের মাথায় মাথায় রোদের ঝিকিমিকি, নীচে সোনাঢালা আলো।

বাপ ছেলে দু'জনের মনই যেন উদাস হয়ে গেছে!

নীরবতা ভঙ্গ করে গৌরাঙ্গ একবার বলে—তুই যে 'লক্ষ্মণের ফল ধরে' বসে রইলি বাদল, মালা পরলি না?

বাদল মাথা নেড়ে বলে—বাড়ী গিয়ে পরবো। কখন বাড়ী যাবো বাবা?

—এই আর একটু পরেই।

আবার খানিক নীরবতা!

একটু পরে বাদল নড়ে চড়ে বাবার কাছে আরো একটু নিবিড়

হয়ে বসে বলে—কাল রেতে যখন গান হচ্ছিলো বাবা, তোমাকে ঠিক ছবির ঠাকুরের মতো দেখাচ্ছিলো।

গৌরাঙ্গ বলে—দূর, বলতে নেই!

—আমার যে তেমনি লাগছিলো বাবা! বাড়ীতে যখন গান গাও, অমনি সাজ করো না কেন?

—বাড়ীতে? গৌরাঙ্গ হেসে উঠে বলে—তাহলে তোর মামা পিঠ ভাঙবে।

—ঈস! ভাঙবে বৈ কি! আমি বড়ো হলে তোমার জন্যে আরো অনেক অনেক সুন্দর আসর খাটাবো বাবা। তুমি তো গান গাইবে? আর সবাই 'হাঁ' করে শুনবে।

গৌরাঙ্গ ছেলেকে কাছে টেনে বলে—বড়ো হলে তুইতো আমাদের 'ভবঘুরে অপেরা পার্টি'র দল গড়বি রে!

তাও তো বটে!

বাদল সোৎসাহে বলে—পার্টি কবে খোলা হবে বাবা?

—হবে! হবে! টাকার জোগাড় হলেই হবে।

—কতো টাকা লাগবে বাবা?

—অনে—ক!

—নতুন মাসীমার অনেক টাকা আছে!

ছেলের মনের গতি অনুমান করে হেসে উঠে গৌরাঙ্গ বলে—লোকের আছে, তো আমার কি রে?

বাদল লজ্জিত হয়ে চুপ করে যায়। কিন্তু শিশুর চঞ্চল মন একটু পরেই বলে ওঠে—দেখো দেখো বাবা, আকাশটা কী লাল হয়ে গেছে! সূয্যিমামা এবার পাটে বসেছেন, না?

—হুঁ!

—গান গাও না বাবা! বেশ ঝিরঝির হাওয়া বইছে!

—ওব্ বাবা, বাদলবাবু যে কবি হয়ে উঠেছে দেখছি! কোন্ গানটা গাইবো বল্?

—তোমার যা ইচ্ছে! কালকের গানটা!

—কাল তো কতোই গাইলাম। রোস্ একটা নতুন গান গাই!

অভ্যস্ত মাজা গলায় গেয়ে ওঠে সে—

ভুল করে তুই কূল খোয়ালি
কদম্বেরই মূলে—
ও রাই জানিসনে কণ্টক আছে,
ওই কদম্ব ফুলে। ও রাই! ওই—
কদম্ব ফুলে।

তুলসীতলায় প্রদীপ দেবার সময় হয় হয়, গ্রামে ঘরে ,মেয়েরা তুলসীতলা নিকিয়ে বাড়ীর সব দরজার চৌকাঠে চৌকাঠে জল ছড়া দিচ্ছে, যারা গরু বাছুর চরতে পাঠিয়েছে তারা ছেলেপুলেকে ডাকার মতোই নিজস্ব ভঙ্গীতে আপন আপন গরু বাছুরের নাম ক'রে উচ্চৈস্বরে ডাক দিচ্ছে—'বুধী আ···য়!···মুঙ্‌লি···আ·· য়!···রাঙি···আ···য়!'

বয়স্থা গৃহিনীরা জপের মালা হাতে 'ঠাকুর দোরে' গিয়ে বসেছেন, গোধূলীর আলোটা নিভে এসেছে—এই সময় গরুর গাড়ীটা এসে ঘোষাল বাড়ীর সদরে দাঁড়ালো।

ঠিক সেই সময় বাসন্তী এসেছে সদর দরজায় জল ছড়া দিতে।

গরুর গাড়ীটাকে থামতে দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছিলো, বাদলকে নামতে দেখেই উল্লসিত অভ্যর্থনা করে ওঠে—ওমা বাদলসোনা, আজই এসে গেলি? আয় আয় আহা এই রোদে এতোখানি রাস্তা গরুর গাড়ীতে আসতে বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে! কী ঠাকুর-জামাই, বড়ো লোকের বাড়ী বুঝি মন টেঁকলো না?

গৌরাঙ্গ গাড়ীর ঝাঁকুনির প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটা আড়ামোড়া ভেঙে বলে—যা বলেছেন! সাধে কি আর বলি বৌদি, আমার মনের কথা শুধু আপনিই বুঝেছেন!

গৌরাঙ্গর দরাজ গলা, ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছয়।

শশধর তখন সবে আসন পেতে সন্ধ্যা গায়ত্রী করতে বসেছে। উঠতে পারে না, নিরুপায় ক্রোধে পৈতে হাতে ধরে কান খাড়া করে বসে থাকে।

—মা কোথায় মামী? হাতের ফুলের মোড়কটা, আর কোঁচা সামলাতে সামলাতে প্রশ্ন করে বাদল।

—তোর মা কি আর একখুনি পাড়া বেড়িয়ে ফিরেছে? কী এ? ফুল না কি?

—ফুল নয়, মালা! একটা আমার, একটা বাবার।

মোড়কটা মামীর হাতে তুলে দেয় বাদল।

বাসন্তী মোড়কের বাঁধন খুলতে খুলতে সহাস্যে বলে—তাই না কি? বড়োলোকরা শুধু ফুলের মালাতেই বিদেয় সারলো না কি ঠাকুরজামাই?

হাসতে হাসতে একটা মালা বাদলের 'আপাদকণ্ঠ' লম্বিত করে দিয়ে বাসন্তী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে—কেমন দেখাচ্ছে দেখো ঠাকুর-জামাই? ঠিক যেন যশোদার গোপাল! মাথায় চূড়ো আর হাতে বাঁশী ধরিয়ে দিলেই হয়।

—ধেৎ!—লজ্জিত প্রতিবাদ জানিয়ে বাদল হাসি হাসি মুখে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজ রূপ দেখতে থাকে। বাকী মালাটা হাতে নিয়ে বাসন্তী গৌরাঙ্গর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—এই নাও মশাই, তোমার ভাগ! পরো না একবার, কলির গৌরাঙ্গ দেখে চক্ষু সার্থক করি!

নেহাতই সহজ পরিহাস, কিন্তু সংসারজ্ঞানহীন গৌরাঙ্গ হঠাৎ একটা বেয়াড়া কাণ্ড করে বসে। বাসন্তীর হাত থেকে মালাগাছটা নিয়ে সহসা বাসন্তীরই গলায় পরিয়ে দিয়ে হাত উল্টে সুর করে গেয়ে ওঠে—

'মালা নয় সখী, মালা নয়,
এ যে আমার হৃদয় জ্বালা!'

এ কাঠখোট্টা গলাতে কি আর মালা মানায় বৌদি! যেখানে সাজে, সেখানে থাক।

সহসা ঘটনাস্থলে বোমা বিস্ফোরণ হয়! শশধররূপী বোমা!

বাসন্তীকে হাত আর চোখের ইঙ্গিতে 'ভেতরে যাও' এই নির্দ্দেশ দিয়ে, গৌরাঙ্গর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি? এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, না তাড়িখানা?

মুখোমুখি এমন আক্রমণ কখনো করে না শশধর। কিন্তু এমন নির্জ্জলা বোকামীই বা কবে করেছে গৌরাঙ্গ?

ও হতভম্ব হয়ে শশধরের দিকে চেয়ে থাকে, আর মালাগাছটা খুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে যায় বাসন্তী।

পায়ের খড়ম দিয়ে মালাটা রগড়ে পিষতে থাকে শশধর, যেমন করে জুতোর তলায় একটা কেঁচো কেন্নো কি কদর্য্য কীটকে পিষতে থাকে লোকে।

যেন ঘসে ঘসে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারলে তবে রাগ আর ঘৃণা মেটে!

ঘৃণা, ঈর্ষা, সন্দেহ, আর ক্রোধের সংমিশ্রনে শশধরের মুখটা যেন প্রেতের মতো দেখায়!

স্টেশনমাষ্টারের খুবরি থেকে বেরিয়ে আসেন প্রবীণ মাষ্টারদা। উচ্ছ্বসিত আনন্দে নবীন বন্ধুটিকে প্রায় আলিঙ্গন করে বলে ওঠেন—এসো এসো! আজই ফিরলে তা'হলে? বেশ করেছো, বেশ করেছো, বেশ করেছো! তারপর কেমন দেখলে? লোকগুলো সমজদার বলে মনে হলো?

গৌরাঙ্গ একটা প্যাকিং বাক্সের উপর বসে পড়ে ভ্রান্ত ভাবেবলে—সমজদার বলে? দারুণ সমজদার! এমন সমজদার যে গান শুনে গলার হার খুলে বকশিশ করতে আসে!

—গলার হার? মেয়েলোক না কি?

—তবে আবার কি? বাড়ীর ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে—'সন্দেশ মণ্ডা খাও', বলে 'তোমার ছেলের আমি মাসী হয়েছি, তার খেলনা কিনতে টাকা নাও, তোমার গান শুনে আমি খুসি হয়েছি, আমার গলার হার প্যালা নাও—' সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার!

মাষ্টার একটু ইতস্ততঃ করে বলেন—বয়েস কম বুঝি মেয়েটার?

গৌরাঙ্গ সবেগে মাথা নেড়ে বলে—কম? মোটেই না। কম হলে তো বুঝতাম বুদ্ধিসুদ্ধি হয়নি। কোন্ না চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়েস হবে। আসলে মনে হলো, মাথায় ছিট্ আছে।

মাষ্টারমশাই যতোই স্বপ্নবিভোর হোন তবু গৌরাঙ্গর চাইতে একটু বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন, তাই তাঁর কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁকে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দেয়। অতঃপর বলেন—বিধবা মেয়ে?

—বিধবা? তা' কি করে জানবো? আমার কেমন মন মেজাজ বিগড়ে গেলো, চলে এলাম!

মাষ্টারমশাই ওর পিঠে একটা চাপড় ঠুকে বলেন—বেশ করেছিস! ওসব মেয়েছেলে বড়ো সর্বনেশে! যাক গে—আমায় একটা গান শোনা।

—নাঃ! গৌরাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে—আজ আর হবে না। আজ গানটান আসবে না। আচ্ছা মাষ্টারদা, মানুষ কেন এতো বোকা বলতে পারো?

মাষ্টারমশাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান।

—বলছি—কেন তার এতো ঘোর প্যাঁচ, রাগ হিংসে? কী ক্ষতি বলো তো, যদি হেসে খেলে গান গেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়? এই পৃথিবী, এই আলো, এই বাতাস, এর দিকে তাকিয়ে দেখবারও ইচ্ছে হয় না কেন মানুষের?

মাষ্টার মৃদু গম্ভীর হাস্যে বলেন—মানুষ যে ভারী বুদ্ধিমান জীব

রে! হেসে খেলে গান গেয়ে কাটিয়ে দিলে, সেই বুদ্ধির প্যাঁচ্‌-গুলো কসবে কখন? পৃথিবীতে এতো আলো, এতো হাসি, তবু মানুষ বুদ্ধির ভারে ভারী হয়ে বসে থাকে। বুদ্ধি আর আনন্দ, এ দুটোয় যে সতীনের সম্পর্ক, বুঝলি?

অনেকক্ষণ বসে থেকে মাষ্টারমশাই বলেন—তোর আজ মনটায় জুং নেই, আয় ঘরে আয়, বরং 'পালা'টা খানিক শোন—

ছোট খুপরিটায় ঢুকে যায় দুজনেই।

টেবিলের উপর বসানো হয় চৌকো লণ্ঠনটা। যেটা নিয়ে শেষ-রাত্রে গাড়ী পার করতে যান মাষ্টারমশাই।

কোণ ফুটো করে দড়ি বাঁধা জাব্দা হিসেবের খাতার মতো পালার খাতা বার করে গুছিয়ে বসেন মাষ্টার। একটু কেশে নড়ে চড়ে সুরু করেন—'রামের বনবাস যাত্রা কালে লক্ষণ ও উর্ম্মিলার সাক্ষাৎকার।' রামায়ণে সীতাকে নিয়েই যতো নাচানাচি, উর্ম্মিলার কথা ভাবে না, দেখেছিস? সে বেচারী যেন বোবা! এখানে উর্ম্মিলার মুখে কিছু জোরালো কথা দিয়েছি, বুঝলি? লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার কাছে বিদায় নিতে এসে বলছেন—

অয়ি বরাননে, প্রাণাধিকা প্রেয়সী আমার
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে দেহ লো বিদায়
পিতৃসত্য রক্ষা তরে যাব বনবাসে।

উর্ম্মিলার উক্তি—

পরম পণ্ডিত তুমি রঘুবংশধর
বলো না মূঢ়ের মতো কথা।
পিতৃসত্য রক্ষা তরে রাম যেতেছেন বনে
তুমি যাইতেছ সাথে ক্রীতদাস সম।
রাজার নন্দিনী সীতা চির আদরিণী,
বনবাসে পাছে তাঁর

হয় কোনো ক্লেশ, শঙ্কা জাগে
বন্য পশু হেরি, তাই তুমি যাইতেছ
সশস্ত্র প্রহরী, অধম সেবক হয়ে।

কেরোসিন শিখার সামনে মাষ্টারমশাইয়ের মুখটা ভারী উজ্জ্বল দেখায়। শুধু আলোয় উজ্জ্বল নয়, সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল।

একবার মুখ তুলে বলেন, মন্দ হচ্ছে না, কি বলিস?

—মন্দ? অভিভূত গৌরাঙ্গ রুদ্ধকণ্ঠে বলে—অদ্ভুত ভালো হয়েছে! কি করে যে লেখেন, তাই অবাক হয়ে ভাবি। 'ভাব' তো আমারও অনেক আসে, কিন্তু কথা জোগানোই যে মুস্কিল! এতো কথা কোথা থেকে জোগায়?

মাষ্টার পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলেন—তুই যখন গান গাস, আমিও ভাবি—কি করে এমন গলা খেলাস? কিন্তু কথা হচ্ছে উর্মিলা সাজবে কে?

—সেই তো ভাবনা! 'ভাব'ই ধরতে পারে না কেউ! আচ্ছা সে ভগবান জুটিয়ে দেবেন অবিশ্যিই—এখন বাকীটা শেষ করুন।

—হ্যাঁ। কি হলো—ও, এবার লক্ষ্মণ বলছেন—

—বৃথা ভৎর্স প্রাণাধিকে, বৃথা করো তিরস্কার।
জন্মিবার আগে আপন জননী মোর
লিখে দিল ভালে, আজন্মের দাসখত।

একশো বছর আগের ভাষায় লিখিত এই 'রাম বনবাস' পালাকে অবলম্বন করে স্বপ্নসৌধ গঠিত হতে থাকে।

এ যুগে যে পরমাণু বোমাও সেকেলে হয়ে গিয়েছে, সে বার্ত্তা ওদের কাছে পৌঁছয়নি।

ওদিকে নিভাননী এক বার্ত্তা নিয়ে বাড়ী ঢোকেন। মেয়ের নাম করে হাঁক দেন—সুধা শুনেছিস? চতুর্ভুজ যে চললেন!

সুধা সাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে—তাই না কি ? কে বললো ?

ওদিকে রান্নাঘরে বাসন্তীর বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে !

'নারায়ণ চললেন !'

তার আর দেখা হলো না ! মাসখানেক হতে চললো 'তিনি' এখানে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন, কানা খোঁড়া আতুর অন্ধ পর্যান্ত কেউ বাকী রাখলো না দেখতে, শুধু বঞ্চিত হয়ে রইলো বাসন্তী !

নিভাননী মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন—পাড়া ঝেঁটিয়ে আবার চললো দর্শন করতে। এ ভাগ্যি তো আর হবে না। আমায় বলছিলো বাঁড়ুয্যে গিন্নী, আমি আর গেলাম না। বললাম 'একবার হয়েছে ওই ঢের ! এই বাতের হাঁটু নিয়ে আর এক কোশ রাস্তা ভাঙতে পারি না !'

সুধামুখী বলে—তোমার মালিশটা বুঝি হচ্ছে না ? হবে কোথা থেকে ? করছে কে ? ছেলের বৌ তো তোমার রাই-রাধা ! খালি গালগল্প হাসিঠাট্টা পেলেই হলো ! বুড়ো শাশুড়ীর সেবার ধার ধারবে কখন ? এসো দিকি আমি একটু মালিশ করে দিই !

নিভাননী অবশ্য মেয়েকেও সমীহ করেন না, তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন—থাম সুধা ! তোর ক্ষ্যামতা যে কতো, সে আর আমার জানতে বাকী নেই !

মাতাকন্যার কণ্ঠ নীরব হয়, আর বাসন্তী একা রান্নাঘরে নীরবে চোখের জল ফেলে।

শশধরের তখনকার সেই অপমান বড়ো মর্মান্তিক লেগেছে। সেই ভারাক্রান্ত মনে নতুন করে এই নারায়ণ অন্তর্ধানের ধাক্কা !

রাত্রে অভিমানবশে একটা মাদুর পেতে মাটিতে শুয়েছিলো বাসন্তী। শশধর তাকে যে অপমান করেছে, তাতে আর বিছানায় শুতে রুচি নেই তার।

শশধর দাবার আড্ডা সেরে রাত করে ফেরে। ঘরে এসে বাঁকা কটাক্ষে একবার বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে গায়ের জামাটা খুলে দেয়াল-আলনায় ঝুলিয়ে রাখলো, চৌকীর ধারে টুলের উপর রক্ষিত জলের কুঁজো থেকে একগ্লাস জল খেলো ঢক্‌ঢক্ করে, তারপর ধীরেসুস্থে চৌকীতে পা ঝুলিয়ে বসে গম্ভীর প্রশ্ন করলো—মাটিতে শোয়া হয়েছে যে ?

বলা বাহুল্য বাসন্তী নির্বাক !

—মাটিতে শুয়ে ঠাণ্ডা লাগাবার কী দরকার পড়েছে ?

তথাপি বাসন্তী নিস্তব্ধ !

শশধর একটু সময় ক্ষেপণ করলো। তারপর ডিবে খুলে এক সঙ্গে দুটো পান মুখে ফেলে, একটু জর্দ্দা খেয়ে আবার সহজ ভঙ্গীতে অথচ মাষ্টারী সুরে বললো—উঠে এসো, অসুখ করবে !

এবারে বাসন্তীর দিক থেকে সাড়া আসে।

—করুক অসুখ !

—'করুক অসুখ ?' বাঃ ! যতো সব বাজে কথা !

বাসন্তী এবার উঠে বসে। রুদ্ধকণ্ঠে বলে—'বাজে' কিসের ? আমি মলেই তো তুমি বাঁচো ! খুব অসুখ করুক আমার, বেড়ে বেড়ে মরে যাই ! তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি !

—হুম্ ! শশধর মুহূর্ত্ত গুম্ হয়ে থেকে ব্যঙ্গতিক্ত স্বরে বলে—তুমি মলে 'ঠাকুর জামাইয়ের' কি হবে ?

বড়ো বড়ো দুই চোখে তীব্র একটা ভর্ৎসনা হেনে বাসন্তী ফের ঝুপ করে শুয়ে পড়ে।

শশধর উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা পায়চারি করে নিয়ে বাসন্তীর মাদুরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ভীষণ স্বরে বলে—ওসব মান অভিমানের ঢং রাখো, আমি আজ একটা হেস্তনেস্ত চাই ! এই আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো দিকি, ওই পাজীটার সঙ্গে আর কথা কইবে না !

বাসন্তী আবার উঠে বসে।

ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—আমি তো পাগল নই।

শশধর জ্বলন্ত স্বরে বলে—হুঁ, এই উত্তরই হবে আমি জানতাম। সত্যিকার সতী মেয়েমানুষ হলে হেলায় এ প্রতিজ্ঞা করতে পারতো। অসতী মেয়ে মানুষরা—

—কী? কী বললে? এই কথা বললে তুমি আমাকে?

শশধর কিন্তু বাসন্তীর এ মর্মাহত ভাবে দমে না। তেমনি স্বরেই বলে—পরপুরুষে যার মন, পরপুরুষে যার গলায় মালা দেয়, তাকে আবার ও ছাড়া কি বলে?

—বেশ। বাসন্তী স্থির স্বরে বলে—অসতী স্ত্রী নিয়ে ঘর করবার কি দরকার তোমার? আমি মরে তোমায় রেহাই দিয়ে যাবো।

শশধর ঈষৎ নিরুপায় সুরে বলে—ওই তো খালি লম্বা লম্বা কথা আছে। 'মরবো, তবু ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করতে পারবো না।' উঃ এতেও লোকে সন্দেহ করবে না?

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বাসন্তী। ঘুম ভাঙলো খুব ভোরবেলা। তাকিয়ে দেখলো শশধর ঘুমোচ্ছে। মনে হলো, ও যদি উঠে দেখে বাসন্তী মরে রয়েছে, বেশ হয়—ঠিক হয়।

নাঃ মরবেই সে।

নিঃশব্দে উঠে একটা ঘড়া হাতে করে রান্নাঘরের পিছন দিয়ে বেরিয়ে চললো পুকুরঘাটের উদ্দেশে। কিন্তু হায়, বাসন্তীর ভাগ্যে পুকুরের জলও দুর্লভ। শীতের শেষ, পুকুরের জল শুকিয়ে হাঁটুর-নীচে।

পুকুরধারে প্রকাণ্ড একটা কল্কে ফুলের গাছ। তারই তলায় পুকুরের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নজর পড়লো পায়ের কাছে। শুকনো পাতার উপর এখানে সেখানে ছড়ানো কল্কে ফলের গাদা।

কঙ্কে ফল।

মুহূর্তে একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেলো। এই তো হাতের মধ্যে মৃত্যু। বরাবর শুনে এসেছে কঙ্কে ফল বেটে খেলে না কি মৃত্যু অবধারিত।

তবে ?

মুক্তি যদি হাতের মুঠোয়, তবে অহরহ কেন সহ্য করা এই নাগপাশের বন্ধন যন্ত্রণা ? আলো ফোটেনি, হাতের আন্দাজে গাছতলায় শুকনো পাতার ওপর পড়ে থাকা ফলগুলো কুড়োতে কুড়োতে ভাবে—আশ্চর্য ! মুক্তির এমন সহজ উপায়টা তার এতোদিন মনে পড়েনি কেন ? কেন এতোদিন ধরে বেঁচে থেকে যম-যন্ত্রণা সহ্য করেছে ?

বাসন্তী জানে না এটা বিধাতার দেওয়া বিভ্রান্তি। যথাযথ সময়ে যদি মুক্তির অমন সহজ উপায়টা মনে পড়ে যেতো মানুষের, তা'হলে লীলাময় বিধাতার লীলাখেলা ফুরিয়ে যেতে দেরী হ'তো না।

হাতের মুঠোয় মুক্তি নিয়েও মানুষ কাঁদবে, ছটফট করবে, মাথা খুঁড়বে, দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, এই নিয়ম। এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারই চলে আসছে নিরবধি কাল।

যাক, আজ বাসন্তীর বিভ্রান্তি ঘুচেছে, আজ সে মুক্তিমন্ত্র আবিষ্কার করেছে। সে মন্ত্র আর কিছু নয়—কঙ্কে ফল !

কিন্তু একথা কেউ কোনোদিন বলে দেয়নি বাসন্তীকে, ঠিক কতোগুলো ফল সংগ্রহ করতে পারলে অবধারিত ফল পাওয়া যায়। কে জানে, এক কুড়ি ফল বেটে খেতে গেলেই বা খাওয়ার উপায়টা কি ? মরতে যাচ্ছে বলেই যে অখাদ্য জিনিষটা অক্লেশে তারিয়ে তারিয়ে খাবে, সেই বা কেমন করে সম্ভব ? যাই হোক, লোকচক্ষুর অগোচরে জিনিষগুলো তো জোগাড় হোক, তারপর দেখা যাবে।

মোট কথা আজ সে মরবেই। দেখিয়ে দেবে শশধরকে, শশধরের

মুঠো ফস্কে পালিয়ে যাবার বুদ্ধি বাসন্তীর আছে। দেখিয়ে দেবে সতী মেয়ে কা'কে বলে।

কিন্তু কতোগুলো কুড়োবে?

সে কথা জানা নেই বাসন্তীর। তাই আঁচল ভর্ত্তি করে কল্কে ফল সংগ্রহ করতে থাকে সে।

পাখীর কলকাকলী সুরু হয়ে গেছে, পূবের গায়ে অরুণের আভাস দেখা দিয়েছে, একটু পরেই সূর্য্য উঠবে। বাসন্তীর জীবনের এই শেষ সূর্য্যোদয়। কাল সকালের সূর্য্যোদয় আর বাসন্তী দেখতে পাবে না।

হঠাৎ যেন বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক অশ্রু উপচে পড়ে বাসন্তীর উজ্জ্বল কালো দুটি চোখের কোল বেয়ে।

পৃথিবীতে এতো আলো, এতো সুর, এতো শোভা, এ সবের উপর আর কোনো দাবী থাকবে না তা'র। বাসন্তীর জীবন থেকে এ সবই ফুরোলো।

এই ভাঙা ঘাটটা কি কোনোদিন মনে করবে—রোজ বাসন্তী ওর সিঁড়িতে এসে বসতো? এই আগাছার জঞ্জালে ভরা বাগানটা কি কোনো দিন খেয়াল করবে, ওর বুকে ঝরে পড়া শুকনো পাতার রাশির উপর বিচিত্র শব্দের ব্যঞ্জনা তুলে দিনান্তে শতবার আনাগোনা করতো বাসন্তী, সংসারের অসংখ্য প্রয়োজনে?…আর…আর…ওই বিরাট-দেহ কল্কে গাছটা?…ও কি কোনোদিনও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না? আক্ষেপ করে ভাববে না—তা'র কাছে যদি জমানো না থাকতো অবধারিত মৃত্যুবিষ, তা'হলে হয়তো বাসন্তী আরো কিছু দিন এই পৃথিবীতে—

আর ভাবতে পারে না বাসন্তী, চোখের জলের স্রোতে তার চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে যায়…নিজের মৃত্যুশোকে নিজেই কাঁদতে থাকে সে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে।

হায়! শশধর এতো নিষ্ঠুর কেন?

কিন্তু দৈবও যেন বাসন্তীর সঙ্গে শত্রুতা সাধছে। নইলে এই ভোরবেলা গৌরাঙ্গর কী দরকার পড়েছিলো ঘাটে আসবার? প্রাতঃস্নান সে করে বটে, কিন্তু সে তো দীঘির ঘাটে।

মরণের সংকল্প নিয়েই এসেছে বাসন্তী। তবু কেমন একটা ভয়ে ভারী অস্বস্তি হতে থাকে তার। শশধর যদি হঠাৎ উঠে বাসন্তীকে ঘরে দেখতে না পেয়ে এদিকে আসে? আর গত রাত্রের সেই তিক্ত তিরস্কারের পর আবার যদি আজ এই ভোরবেলায় নির্জ্জন পুকুরঘাটে দু'জনকে একত্রে দেখে?

অথচ বাসন্তী একে বারণই বা করবে কি করে?

গৌরাঙ্গর সরল হাস্যের সামনে যে সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা লজ্জায় মাথা হেঁট করতে চায়।

অন্য লোক হলে হয়তো একা বাসন্তীকে স্নানের ঘাটে দেখে সরেই যেতো, কিন্তু গৌরাঙ্গর সে বালাই নেই। ও বরং দ্রুতপদে কাছে এসে বলে ওঠে—এ কী বৌদি, আপনি আবার এতো ভোরে স্নান করতে এসেছেন কেন? যান যান এখন লেপ মুড়ি দিয়ে শুনগে, এখন ডুবটি দেবেন, কি সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি ধরে যাবে।

এই সামান্য স্নেহসূচক কথাতেই বাসন্তীর চোখের কোলে কোলে জল এসে যায়। আসল কথা—আপন মৃত্যু শোকেই ভিতরে ভিতরে যে অশ্রুসমুদ্র উথলে উঠছিলো তার।

কান্না ঢাকতে বাসন্তী ঘাড় ফিরিয়ে বলে—যাক না!

—এ কী! কি হলো! আরে, কাঁদছেন মানে?

বাসন্তী বাক্যহারা।

—কী মুস্কিল! কেঁদে পুকুরের জল বাড়িয়ে দিলেন যে?

এবারে বাসন্তী চোখ মুছে বলে—দিলাম তো তোমার কি? কাঁদছি আমার খুসি।

—ভালো! খুসিতে যে মানুষ কেঁদে ভাসায়, এই প্রথম দেখছি। দাদার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছেন বুঝি?

—ঝগড়া! আমাকে খালি ঝগড়া করে বেড়াতেই দেখো বুঝি?

গৌরাঙ্গ হেসে উঠে বলে—আহা আপনি—মানে—ইয়ে বুঝছেন না, মানে দাদা বোধহয় ঠেশে বাক্য-মাধুরী বর্ষণ করেছে। তাই তো? সত্যি, সুধামুখী আর দাদা, বিধাতাপুরুষ বোধকরি এই দুটি ভাইবোনের জিভ দুখানি গড়বার সময় লঙ্কার আরক মাখিয়ে ফেলেছিলো। আপনার কি মনে হয়?

আপন রসিকতায় আপনিই হেসে আকুল হয় সে।

বাসন্তী সহসা তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে—হয়েছে হয়েছে, আর হাসতে হবে না, তোমার এই হাসিই সর্বনাশী!

—বাঃ! হাসির অপরাধটা কি হলো? হাসবো না তো কি, এ বাড়ীর মতো গোমড়া মুখের চাষ করবো? হাসলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে বুঝলেন?

বাসন্তী নিরুপায় হতাশ সুরে বলে—আচ্ছা ঠাকুরজামাই, তুমি কি সত্যি পাগল? ও আমাদের সন্দেহ করে বুঝলে? তোমাকে আমাকে দু'জনকে!

কথাটা যেন কিছুই নয়, এইভাবে গৌরাঙ্গ বলে—আহা, সে তো দেখতেই পাই! ওটা একটা ব্যাধি, বুঝলেন বৌদি, রীতিমত একটা ব্যাধি! দিন দিন যে রকম বেড়ে চলেছে, এর একটা দাওয়াই দেওয়া দরকার।

বাসন্তী যেন এবার সম্বিৎ ফিরে পায়, উত্তেজিত স্বরে বলে—দাওয়াই খুঁজতেই তো এসেছি! এমন দাওয়াই দেবো, যে জন্মের মতো ও ব্যাধি ঘুচে যাবে ওর!

উত্তেজনার মুখে চাঞ্চল্যের জন্যই বোধকরি বাসন্তীর অঞ্চলে সংগৃহিত বিষফলগুলি ছড়িয়ে পড়ে যায় আঁচল আলগা হয়ে।

গৌরাঙ্গ অবাক হয়ে 'হাঁ হাঁ' করে ওঠে—আরে আরে পড়ে গেলো

কি? সকালবেলা ডাঁসা পেয়ারা পাড়তে এসেছিলেন না কি? আরে কি এ? কন্ধে ফল?

অকারণে উর্দ্ধমুখে গাছটার দিকে একবার তাকিয়ে, তারপর একটা ফল কুড়িয়ে তুলে গৌরাঙ্গ বলে—এতে কি হবে?

—কি হবে জানো না? বাসন্তী ঝাঁজের সঙ্গে বলে—তোমার দাদার রোগ সারবে। বেটে খাবো—খেয়ে মরবো!

—ওঃ তাই! গৌরাঙ্গরও রাগ আছে দেখা যাচ্ছে, ক্রুদ্ধ স্বরে বলে ও—তাই রাত না পোহাতেই বাগানে আসা হয়েছে? ছড়ানো ফলগুলো একটা একটা করে তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পুকুরে ফেলতে ফেলতে সে আবার বলে—আপনি তো দেখছি সাংঘাতিক মেয়ে? দাদা তা'হলে অন্যায় শাসন করে না?

বাসন্তী তীব্র স্বরে বলে—সেই শাসনের জ্বালাতেই তো আত্মঘাতী হতে সাধ গিয়েছে। এতো বন্দী জীবন আর সহ্য হয় না আমার।

গৌরাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে—উহুঁ, আপনার এটা বড্ডো ভুল হচ্ছে বৌদি! দাদার জিভটা খারাপ, কিন্তু লোক খারাপ নয় দাদা। আচ্ছা দাঁড়ান একটা কথা মনে এসেছে, আপনাদের চতুর্ভুজের কাছ থেকে কতো লোক কতো ওষুধ আনছে শুনছি, দাদার জন্যে একটা আনলে হয় না? ওই সন্দেহ রোগটা যাতে যায়!

বাসন্তী এ কথায় সহসা আশান্বিত হৃদয়ে বলে—তোমার এ সব বিশ্বাস হয় ঠাকুরজামাই?

গৌরাঙ্গ দুই হাত উল্টে বলে—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা বুঝি না বৌদি, দশ জনে যখন মানছে, থাকতেও পারে কিছু। যাবো একবার?

সহসা স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে গিয়ে বাসন্তী গৌরাঙ্গর একটা হাত চেপে ধরে বলে—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারো ঠাকুর-জামাই?

—আপনাকে? বলেন কি? দাদা মত দেবে?

—মত? বাসন্তী মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে—যমের বাড়ী ছাড়া

আর কোথাও যেতে মত দেবে না ও, এ তুমি ঠিক জেনো ঠাকুর-জামাই! যা থাকে কপালে, ওকে না জানিয়েই যাবো। একবার দেখবো—ওর মন বদলাবার অষুধ দেবার সাধ্য স্বয়ং ভগবানেরও আছে কি না। যাবোই আমি, আজই যাবো।

—এই সেরেছে, আজ যে রবিবার! দাদা তো কাজে যাবে না, কাল ছুপুরে বরং চুপি চুপি—

—কাল? কাল তো নারায়ণ বাস্থলপুরের বাস ওঠাবেন!

—এই দেখো! এ কথা আবার কে বললো আপনাকে?

—মাতে ঠাকুরঝিতে বলাবলি করছিলেন কাল, এখান থেকে যাবেন জিয়াগঞ্জের মেলায়!

গৌরাঙ্গ চিন্তিত ভাবে বলে—তবেই তো!

ভোরে পাখীরা ডাকাডাকি স্থরু করেছে···সকালের আলো এসে পড়েছে বাসন্তীর মুখে, গায়ের উপর গাছের পাতার ছায়া। বাসন্তী চারিদিকে তাকিয়ে দেখে···এই পৃথিবী! একে কি ছেড়ে যাওয়া যায়?

ঠিক এই সময় সুধামুখীকে আসতে দেখা যায় এদিকে, কাঁধে গামছা, কাঁখে কলসী, হাতে তেলের শিশি। ওকে দেখেই এরা ষড়যন্ত্র বন্ধ করে ফেলে।

এতো ভোরে দুজনকে নিবিষ্ট আলাপে রত দেখে সুধার মুখখানা হাঁড়ি হয়ে যায়, একবার থমকে দাঁড়ায়, বোধকরি একবার ফিরে যাবার মনোভাবও আসে, তারপরই কি ভেবে বীরদর্পে দুজনের মাঝখান দিয়ে 'খরখর' করে চলে গিয়ে পুকুরে নেমে, অকারণে গামছা খানা ভিজিয়ে ধোপার কাপড় আচড়াবার মতো করে আছড়াতে স্থরু করে।

আরো একজন যে বাগানের এদিকে আসতে আসতে ভীষণ মুখে ফিরে গেছে, তা' এরা জানতে পারে না।

গৌরাঙ্গ সুধামুখীর এই রাগ প্রকাশের বহর দেখে সকৌতুকে বলে—সুধামুখীর আমাদের বাদলের সঙ্গে খুব বেশী তফাৎ নেই, কি বলেন বৌদি? বলেই বেশ গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠে—

'গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে নামিল ঘাটে।'

বাসন্তী অবশ্য এ কৌতুকে যোগ দিতে পারে না, শুধু ননদের দিকে একবার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলে—কি ঠিক করলে বলো?

গৌরাঙ্গ বলে—তবে এক কাজ করুন, রাত্তিরে চলুন!

—রাত্তিরে?

বাসন্তী অবাক হয়ে তাকায়।

—হ্যাঁ রাত্তিরে! চণ্ডীতলায় তো রাত বারোটা একটা অবধি লোকের ভীড়। বারোটা রাতে গিয়ে দেখবেন, যেন সন্ধ্যে! তা-ই চলুন। কেউ টের পাবে না।

—পাগল! তাই কি হয়? বলে বাসন্তী আঁচলটা নিয়ে আঙুলে জড়াতে থাকে।

—ব্যস! অমনি হয়ে গেলো এক কথায়! বলি 'পাগল' হচ্ছি কিসে? আপনি চান দাদাকে না জানিয়ে চুপি চুপি যেতে! রাত্তির বেলাই তো সে পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময়? জোর পায়ে হাঁটলে এক ঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসতে পারবো। তখুনি কিছু আর শ্রীযুক্ত দাদা কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠছেন না?—গৌরাঙ্গ হেসে ওঠে।

সুধামুখী এ হাসি শুনে, উপর্য্যুপরি গোটাকতক ডুব দেয়, দিয়েই সপসপে ভিজে কাপড়সুদ্ধই আবার ওদের মাঝখান দিয়ে যেন কেটে বেরিয়ে আসে।

—আচ্ছা আপনি ভাবুন বৌদি! বলে গৌরাঙ্গ সরে এসে এদিক ওদিকে তাকিয়ে সুধার অনুসরণ করে। কাছাকাছি এসেই পিছন থেকে অনুচ্চ স্বরে গেয়ে ওঠে—

'চলে নীলশাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি

পরাণ সহিত মোর।'

বাস্তবিকই সুধা চলার অসুবিধায় পায়ের কাছের কাপড়ের অংশটুকু চেপে চেপে জল নিংড়ে ফেলছিল। পতি দেবতার এহেন রসিকতায় ক্রুদ্ধভাবে মুখ ফিরিয়ে বলে—আবার? আবার তুমি আমাকে জালাতে এসেছো? বেহায়া কোথাকার! গান গাইতে ইচ্ছে হয়, তোমার মনের মানুষের কাছে গাওগে না।

—মনের মানুষ? গৌরাঙ্গ যেন সহসা কোন নতুন জগতের বার্তা শোনে, ভাবাবিষ্ট মুখে বলে ওঠে—সে মানুষের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়, তুমি জানো সুধামুখী?

—ঢং!

বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় সুধা। গৌরাঙ্গ অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে চলতে থাকে স্টেশনের রাস্তায়।

চির অভ্যাসে গলায় তার গান।

পথ চলতে গান না গাইলে তা'র চলে না। গাইতে গাইতে চলে—

'আমায় বলে দেরে

ভাই!

(আমি) মনের মানুষ কোথায়

গেলে পাই!'

মনটা উদাস হয়ে আছে বলে যে সংসারের কাজে জবাব দিয়ে বসে আছে বাসন্তী, এমন নয়। নিত্য নিয়মে রান্নার নির্দ্দেশ নিয়েছে শাশুড়ীর কাছে, সারাদিনের সমস্ত কর্ত্তব্য সেরেছে, ডাল ঝেড়েছে, চাল বেছেছে, জল তুলেছে কুয়ো থেকে, গরুর মুখে ধরেছে শ্যামল দুর্বার গোছা, সন্ধ্যা হতেই দিয়েছে তুলসী তলায় প্রদীপ। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে সারাদিন ধরে শুধু ভেবেছে।

এখনো ভাবছিলো উনুনের সামনে বসে। কাঠের উনুনের গন্‌গনে আঙরার আভায় ওর গম্ভীর ফরসা মুখটা যেন প্রতিমার মতো দেখাচ্ছিলো।

গৌরাঙ্গ এসে চৌকাঠ চেপে বসলো।

বললো—কি ঠিক করলেন?

—যাবো। মুখ তুলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভঙ্গীতে বলে বাসন্তী।

—ঠিক আছে। এদিকটা তাহলে একটু চট্‌পট সেরে নিন্‌। আর দেখুন, এক কাজ করবেন—দুই ভাইবোনকে ঠেশে চারটি ভাত বেশী খাইয়ে দেবেন, তা হলেই জঠরের ভারে ঘুমে চোখ ভেঙে আসবে। টের পাবে না!

সমস্ত গাম্ভীর্য্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বাসন্তী হেসে ফেলে বলে—সত্যি ঠাকুরজামাই, তোমার হিসেবে যদি সমস্ত পৃথিবীটা চলতো?

গৌরাঙ্গ কি বলতে গিয়ে উঠোনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলে—বেড়ার দরজায় শব্দ হলো মনে হলো, দাদা ফিরলো বুঝি? দাদার আড্ডা একখুনি ভাঙলো?

বাসন্তীও মৃদু গলায় বলে—আড্ডায় বোধ হয় যাননি আজ।

—হুঁঃ! দাদা আবার আড্ডায় যাবে না! যাক, সকাল সকাল ফিরেছে, ভালোই হয়েছে—(আরো ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে) ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সকাল করে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন। দেখবেন টুঁ শব্দটি করবেন না।

বাসন্তী কেমন ফ্যাকাসে গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—থাক্‌ গে ঠাকুরজামাই, আমার কেমন ভয় ভয় করছে!

—কী মুস্কিল! ভয়টা কিসের? এতো পরামর্শ, এতো ষড়যন্ত্র, শেষে ভয়ে পেছিয়ে যাবেন? কোনো ভয় নেই, চোখকান বুজে বেরিয়ে পড়ুন না একবার!

ওদিকে···রান্নাঘরের ওপিঠে দাঁড়িয়ে একজনের চোখ বিস্ফারিত আর কান তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

আর কেউ নয় শশধর !

গৌরাঙ্গ যতোটা সম্ভব নিম্নকণ্ঠে আরো উপদেশ দিতে থাকে··· যথা—'পিছনের দরজা খুলে· ·ঝোপ্ জঙ্গলের রাস্তাটা দিয়ে'···'সাদা-শাড়ী পরবেন না, অন্ধকারে দেখা যাবে। গরু মনে করে কেউ ঠেঙাতে আসতে পারে'···'রঙিন শাড়ীই নেই আপনার ? তাতে কি ? আপনার ঠাকুরঝির তো মেলাই শাড়ী আছে—লাল নীল হলদে ! পরে নেবেন একটা—'···'খুব সাবধান, একেবারে নিঃশব্দে !'

বাসন্তীর কথা শোনা যায় না বেশী !

যাবার জন্যে সে মরীয়া হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু চির অভ্যাসের ভয় রয়েছে মনে !

অপর পক্ষের সে বালাই নেই। সংসারজ্ঞানহীন লোকটা ভাবে তার এই সশব্দ ফিস্ফিস্ কেউ বুঝি শুনতে পেলো না। কারণ এই মাত্র দেখে এসেছে নিভাননী ইতিমধ্যেই বাদলকে নিয়ে শয্যাশ্রয় করেছেন, আর হ্যারিকেনের মাথায় তেলের বাটি বসিয়ে গরম করে সুধামুখী বেজার মুখে বসে জননীর চরণকমলে গরম তেল মালিশ করছে, আর হাই তুলছে।

শশধর যদি এসেও থাকে, রান্নাঘরের দিকে আসতে যাবে কেন ?

শশধর যে শুধু রান্নাঘরের দিকে এসেই ক্ষান্ত হয়নি, কাঠ ঘুঁটে রাখার মাচা থেকে ভারী আর চকচকে একটা জিনিষ সংগ্রহ করে নিয়ে ঘরে ফিরেছে, সে কথা এদের ধারণার বাইরে।

কেমন করে যে রান্না সেরেছে বাসন্তী, কেমন করে সকলকে খাইয়েছে দাইয়েছে, কে জানে ! যাবার আগ্রহ আর এখন মনের কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না সে, বরং একটা আতঙ্কের ভার মনের মধ্যে চেপে বসেছে।

এখন যাওয়া—শুধু গৌরাঙ্গর কাছে পিছিয়ে যাবার লজ্জায়

গৌরাঙ্গ বলেছে সে আগেই একটু খানি এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, বাসন্তী যেন ভেজান দরজাটি খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে।

হ্যাঁ, রঙিন শাড়ীই একটা পরে নিয়েছে বাসন্তী, ইচ্ছে করেই পরেছে। ভেবেছে ঈষৎ ঘোমটা তো থাকবেই, চণ্ডীতলায় যদিই পাড়ার কোনো চেনা লোকের চোখ পড়ে যায়, সে ভাববে, সুধা। ভাববে, স্বামীর সঙ্গে রাত করে লুকিয়ে চলে এসেছে সুধা—দেব দর্শনে, কি ভাগ্য গণনায়।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামনের মানুষ দেখা যায় না।

কৃষ্ণপক্ষের রাত কি ভরা অমাবস্যা তাই বা কে জানে। তার উপর আবার এ জায়গাটা আগাছার জঙ্গলে ভরা।

সামান্য একটু খস্‌খস্‌ শব্দ···তারপর ফিসফিস শব্দ···'এসেছেন? কেউ দেখে ফেলেনি তো? দেখবেন হোঁচট্‌ খাবেন না। দাঁড়ান, রাস্তাটা একবার দেখে নিন।···ফস্‌ করে একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠে। সে আলোয় মুহূর্ত্তে ঝলসে ওঠে ছুটি অজ্ঞান অপরাধীর মুখ। একজনের কিছুটা ভীত ত্রস্ত, আর একজনের কৌতুকোজ্জ্বল।

কিন্তু আরো একটা জিনিষ মুহূর্ত্তের জন্য ঝল্‌সে ওঠে অপেক্ষাকৃত দূরে। সেটা বাসন্তীদের রান্নার কাঠ কাটবার বড়ো কাটারীটা।

পোড়া দেশলাই কাঠিটা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে গৌরাঙ্গ চাপা হাসির সঙ্গে বলে—বাঃ। দিব্যি মানিয়েছে তো।—ভাবে-ভোলা পাগল লোকটা ক্ষীণ অনুচ্চ স্বরে গেয়ে ওঠে—

'শ্যাম অভিসারে চলে বিনোদিনী রা-ধা!
নীল বসনে মুখ ঢাকিয়াছে আধা—'

মুহূর্ত্তে গানের কণ্ঠরোধ হয়ে যায় একটা হিংস্র ভয়ঙ্কর চাপা গর্জ্জনে। যেন একটা বন্য পশুর হুঙ্কার।

গানের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় একটা আর্ত্তনাদ। কে বুঝি

সেই আনন্দোচ্ছল সুরের কণ্ঠকে নির্মম হস্তে নিষ্পেষিত করতে চায়।

অন্ধকারে দেখা যায় না কিছুই। শুধু অস্ফুট কয়েকটা শব্দ। তার মধ্যে বাসন্তীর গলা—'সর্বনাশ কোরো না গো, ও যে ঠাকুর-জামাই!'

—ঠাকুরজামাই!—চাপা দাঁতে পেষা স্বর 'ঠাকুরজামাই!'

একটা ঠেলাঠেলি, একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি, একটা ঝটাপটির আওয়াজ। বন্য জন্তুর আর্তনাদের মতো একটা আর্তনাদ।

ফের বাসন্তীর চাপা অথচ তীক্ষ্ণ চীৎকার—ঠাকুরজামাই, দোহাই তোমার, পালাও! পালাও এখান থেকে…দেখছোনা ওর খুন চেপেছে।

—কিন্তু বৌদি—দাদা যে আপনাকে—

—আমার যা হয় হোক, তুমি পালাও। বুঝতে পারছো না এভাবে কেউ দেখতে পেলে কী হবে? সে দুর্নাম যে মৃত্যুর বাড়া—দোহাই তোমার, যাও—যাও! যাও বলছি—

একটা দুরন্ত শক্তিকে প্রাণপণে আটকে ধরে রাখার গুরুনিঃশ্বাস তার কথার শব্দের তালে ওঠে পড়ে।

শুকনো পাতার উপর মানুষ দৌড়নোর একটা মড়মড় খস্‌খস্‌ শব্দ। তা'র পর ক্ষণকাল স্তব্ধতা।

সে স্তব্ধতা যেন মৃত্যুর মতো তুহিন শীতল!

সেই শীতল স্তব্ধতার বুক চিরে একটা দৃঢ় শান্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—নাও এবার আমাকে মারো, কাটো—যা তোমার খুসি—

সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী জিনিষ পড়ে যাওয়ার আওয়াজ!

প্রাণপণে জাপটে যে দেহটাকে রুখে ধরে বাসন্তী গৌরাঙ্গকে পালাবার সুযোগ করে দিলো, তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হাত ছাড়ার সঙ্গেসঙ্গেই অসহায় ভাবে মাটিতে পড়ে যায় সে দেহখানা।

উগ্র উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য মানুষটা, পড়ে যায় নিজেরই হাত থেকে খসে পড়া ধারালো অস্ত্রটার উপর। যেটা রক্ত পিপাসায় 'হাঁ' করে পড়েছিলো ঝোপ জঙ্গলের ঠেক্‌ খেয়ে।

তারপর ?

তারপর ভয়ার্ত্ত বাসন্তীর তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকার।

চাপাগলা, ফিসফিস কথা—তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মনেও নেই আর সে প্রয়োজন।

—মাষ্টারদা, মাষ্টারদা!

ঘুমন্ত মাষ্টারমশাই চমকে গায়ে ঢাকা চাদরটা খুলে ফেলে উঠে বসলেন। কে ডাকে। না কি এ শুধু স্বপ্ন ?

নাঃ স্বপ্ন নয়, আস্ত জলজ্যান্ত মানুষেরই কণ্ঠস্বর। ছোট্ট কাটা জানলায় মুখ রেখে গৌরাঙ্গ ডাকছে ব্যস্ত উত্তেজিত স্বরে—মাষ্টারদা, দোরটা খুলুন তো, ও মাষ্টারদা।

গায়ে ঢাকা চাদরটা মুড়ি দিয়েই দরজা খুলে উঁকি দিলেন মাস্টার-মশাই, অবাক হয়ে বললেন—কী ব্যাপার গৌরাঙ্গ ? এ সময়ে ?

—দাঁড়ান, আগে বসি।—বলে ঘরে ঢুকে পড়ে গৌরাঙ্গ বলে—জল আছে ঘরে ? খাবার জল ?

—সে কি, আছে বৈ কি! বলে একটা কলসী থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে এগিয়ে দেন মাষ্টার। দিয়ে বলেন—কিন্তু কি হলো বল তো ? ভূতে তাড়া করেছিলো না কি ?

এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে নিয়ে গৌরাঙ্গ বলে ওঠে—প্রায় তাই। সে এক ফ্যাসাদ হয়েছে মাষ্টারদা।

আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা গড়গড় করে বলে যায় গৌরাঙ্গ, তারপর বলে—জানি না বৌদির অদৃষ্টে এখন কি আছে। দাদা যে রকম আড়বুঝো—

মাষ্টার গম্ভীরভাবে বলেন—নাঃ, কাজটা ভালো করিসনি গোরা, সে যখন এতো রাগী, তখন তার পরিবারকে এ ভাবে—

—আহা, বৌদির অবস্থাটাও বুঝুন ? এতো লোক যাচ্ছে, সে

বেচারা যেতে পেলো না—তা ছাড়া—যদি দাদার এই রোগটা ভালো হবার ওষুধ মেলে, তাই—

ঠিক এই সময় আর একবার দরজায় ধাক্কা পড়ে—মাষ্টারমশাই, মাষ্টারমশাই।

মাষ্টার উৎকর্ণ হয়ে শুনে নিয়ে বলেন—কে?

—আমি জগদীশ। গৌরাঙ্গদা আছে এখানে?

কম্পিত উত্তেজিত রুদ্ধস্বর।

গৌরাঙ্গ সঙ্গেসঙ্গেই বলতে যাচ্ছিলো—'এই যে আমি আছি—' কিন্তু ছেলেটার এই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসা দেখে, কি ভেবে কে জানে মাষ্টারমশাই তাড়াতাড়ি গৌরাঙ্গর মুখে একবার হাতটা চাপা দিয়ে, নীরব থাকার ইসারা করে এগিয়ে এসে দোরটা চেপে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলেন—কী খবর জগদীশ?

জগদীশ আখড়ারই একটি ছেলে, গৌরাঙ্গ-গত প্রাণ একেবারে। সে বিচলিত বিপর্য্যস্ত স্বরে বলে— সর্বনাশ হয়েছে মাষ্টারদা, শশধর ঘোষাল খুন হয়েছে আর গৌরাঙ্গদাকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাই দেখি এখন—কোথায় সে—পুলিশ এলে তো আগে তাকেই খুঁজবে—

ছেলেটা যেমন ঝড়ের মতো এসেছিলো, তেমনি ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেলো উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করে।

ততোক্ষণে ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় গৌরাঙ্গও, পাগলের মতো চীৎকার করে—খুন হয়েছে। দাদা খুন হয়েছে? ও মাষ্টারদা, নিশ্চয় আমার হাতেই খুন হয়েছে সে। আমি অন্ধকারে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছি, নিশ্চয় পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে—ছাড়ুন, আমাকে ছেড়ে দিন, পায়ে পড়ি আপনার—

বলা বাহুল্য, ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝে মাষ্টার দু'হাতে চেপে ধরেছেন গৌরাঙ্গকে প্রাণপণে। চাপা রুদ্ধকণ্ঠে বলতে থাকেন তিনি—চেঁচা-মেচি করিসনে গোরা, সর্বনাশ ডেকে আনিস নে। তুই এখন সেখানে গেলে কেলেঙ্কারীর বাকী থাকবে কিছু?

—হতে পারে না, অসম্ভব! ছাড়ুন আমায়।

—আঃ গৌরাঙ্গ! উপায় কি? অবস্থাটা ভাব্। একজন তো গেছেই, তুই গিয়ে সত্যি কথা বলতে বসলে দুর্নামের জ্বালায় বৌটাকে যে গলায় দড়ি দিতে হবে। আর তোর পরিবারটা? বাদলার মা? তার কথাটা ভাবছিস না? খুনের দায়িক হতে চাস?

দুর্নাম! বৌদির! সুধার বৈধব্য! গৌরাঙ্গ সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর উদভ্রান্ত ভাবে বলে—তা'হলে কি করবো মাষ্টারদা?

—কি করবি? কি করবি? চলে যাবি—অনেক দূরে চলে যাবি, অনে—ক দূরে। বাম্নুলপুরের মাটিতে আর পা দিবি না! যা, এখুনি যা···কেউ জানতে পারবার আগে তুই যা-রে গোরাচাঁদ, নদীয়া আঁধার করে জন্মের মতো চলে যা! তুই তো বাঁচবি, সবাই তো বাঁচবে—আমার যা হয় হোক, আমার যা হয় হোক!

শেষ কথাগুলো ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে অস্পষ্ট হয়ে যায়। গৌরাঙ্গকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেন মাষ্টারমশাই প্লাটফরমে।

আধ মিনিট থামে গাড়ী।

দূরের থেকে আসছে অনেকগুলো মানুষ বোঝাই হয়ে। একবার সেই ভীড়ের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার ওয়াস্তা। তারপর কে জানতে পারবে পিছনে কী ভয়াবহ ইতিহাস ফেলে রেখে গেলো সে!

মাষ্টারমশাই ওকে ঠেলে ট্রেনে তুলে দিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন কোথাও কিছু হয়নি, যেন এইমাত্র ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনা ঘটে যায়নি ছোট্ট এই গ্রামটায়। যেন সে ঘটনার নায়ককে তিনি চেনেনও না!

হ্যাঁ তিনি জানেন, এমনি করে তাড়িয়ে না দিলে সে যেতো না। বাসন্তীর দুর্নামের ভয় দেখিয়েই তাকে জব্দ করেছেন, নইলে···নইলে ফাঁসির ভয় তাকে বিচলিত করতে পারতো না!

এ ছাড়া তবে আর কি করবেন মাষ্টারমশাই?

অপসৃয়মান ট্রেণটার দিকে তাকিয়ে থাকেন মাষ্টারমশাই। কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়নি, ট্রেণ 'পাশ' অর্ডার দিয়েছেন নিত্যনিয়মে। শুধু ওটা যখন চলে গেলো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন সেই প্রায়ান্ধকার কাঁচা প্লাটফরমটার উপর।

তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসেন নিজের অফিস ঘরে। মনে হয় একটা পাথরের মূর্ত্তি বুঝি মন্থর গতিতে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

ড্রয়ারটায় কি চাবি লাগানো আছে? না, চাবি লাগানো নেই— খোলাই পড়ে থাকে, খোলাই পড়ে আছে।

লক্‌লকে খানিকটা আগুনের শিখা দেখে পয়েটস্‌ম্যানটা ছুটে আসে কোথা থেকে। বলে—কি হলো?

ধীরে ধীরে তাকে একটা হাত নেড়ে চলে যাবার ইসারা করেন মাষ্টারমশাই। এ সময় মানুষ অসহ্য, কথা অসহ্য।

একমাত্র সন্তানের চিতাগ্নির দিকে তাকিয়ে থাকার মতোই অর্থহীন শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মাষ্টার সামনের শিখাগুলোর দিকে। অনেকগুলো খাতা একসঙ্গে জ্বলছে।

সন্তানের চাইতে কি এর মুল্য কিছু কম?

এও তো আপন সৃষ্ট বস্তু—অনেক যত্নের, অনেক পরিশ্রমের, অনেক আশার।

অনাহত কালস্রোত বয়ে চলেছে আপন নিয়মে।

সৃষ্টির আদি থেকে তা'র অক্লান্ত এই চলা। কোথাও দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে পড়বার উপায় নেই, উপায় নেই কোনো দিন ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবার। রূপ নেই, রং নেই, জোয়ার নেই, ভাঁটা নেই, শুধু আছে দিন আর রাত্রির ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে এগিয়ে যাওয়া।

তবু মানুষ তা'তে আরোপ করেছে রং আর রূপ। সময়ের

অনাহত স্রোতকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেনি, তবু ভাগ করে নিয়েছে কাল্পনিক খণ্ডে খণ্ডে। চিহ্ন করে নিয়েছে দিন মাস বছরের হিসেবে।

কিন্তু সে হিসেবের কি সত্যিই কোনো মূল্য আছে?

'দিন' মানেই কি চব্বিশটি ঘণ্টার সমষ্টি মাত্র?

সময়ের ভার কি সকলের কাছেই সমান? যারা সুখী, যারা সহজ, যারা স্বাভাবিক, তাদের কাছে সময়ের কোনো অনুভূতি আছে? তারা জানে গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে, বর্ষার পর দেখা দেয় শরৎ। তারা জানে দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর দিন।

কিন্তু যে অস্বাভাবিক জীবনে শুধু রাত্রিই এসে থেমে থাকে, দিন আর আসে না. জীবনের সমস্ত কপাট রুদ্ধ করে দিয়ে রাজত্ব করতে থাকে শুধু অন্তহীন অন্ধকার, সে তো জানে সময়ের অর্থ কি! সময়ের হিসেব হয় কি দিয়ে!

কতো দিন পালিয়ে বেড়াচ্ছে গৌরাঙ্গ? মানুষে গড়া ক্যালেণ্ডারের হিসেবে হয়তো মাত্র ছ'মাস, কিন্তু সেই হিসেবটাই তো সত্য নয়। ছ'যুগ ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গৌরাঙ্গ তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো। এখান থেকে ওখানে, কাছ থেকে দূরে।

পালিয়ে বেড়ানোরও বুঝি একটা নেশা আছে। যেখানে কেউ ধরে ফেলবার নেই, কেউ চিনে ফেলবার নেই, যারা স্বপ্নেও সন্দেহ করতে পারবে না এই নিতান্ত সহজ চেহারার লোকটার পিছনে রয়েছে একটা রক্তাক্ত ইতিহাস, হতভাগা লোকটা তাদের কাছ থেকেও পালিয়ে যাবে।

একটানা দুটো পাঁচটা দিনও কোথাও টিঁকে থাকবে না। হয়তো কোথাও পাবে এতোটুকু সদয় মমতা, এতোটুকু অহেতুক স্নেহ, অমনি সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠবে তার।

কেন?

কেন এদের এই অকারণ করুণা ? নিশ্চয় ধরিয়ে দেবার মতলব। তবে পালাও সেখান থেকে। পথে ছ'টো লোককে মুখোমুখি কথা কইতে দেখলেই মনে করে ওর কথাই কইছে বুঝি, পিছনে কাউকে হাঁটতে দেখলেই স্থির করে নেয় ওকেই অনুসরণ করছে সে। যে নিজের বুকের মধ্যে সন্দেহের বাসা নিয়ে বেড়াচ্ছে, পৃথিবী তার কাছে সহজ হবে কেমন করে ?

অথচ সত্যিই কি গৌরাঙ্গ প্রাণের ভয়ে এমন ছুটোছুটি করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ? গৌরাঙ্গর স্বভাবের পক্ষে সেটা খাপ খায় ?

নাঃ, গৌরাঙ্গর তো প্রাণের উপর তেমন কোনো মমতা ছিলো না কখনো, সহজ সুন্দর জীবনে থাকতেও নয়। অসঙ্গত অসমসাহসিকতার জন্যেই তো বিখ্যাত ছিলো ও। কেউ কখনো সে দুঃসাহসিকতার প্রতিবাদ করলে হাসতে হাসতে বলতো—'আরে বাবা একবার বৈ তো দু'বার মরবো না ? অতো মেপে জুপে চলতে পারি না।'

সেই মানুষ কেন পালাচ্ছে এমন বিতাড়িত পশুর মতো ?

এই এক অদ্ভুত রহস্য।

সত্য বটে, জড় প্রকৃতি চলে এক অলঙ্ঘ্য নিয়মে—বুদ্ধির অভিব্যক্তিহীন নির্ভুল সেই চলা। মনুষ্য প্রকৃতি চায় নিয়ন্তার সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করতে।

কিন্তু সত্যিই কি পারে ? বোধহয় পারে না। তার স্বাধীন চিন্তাশক্তির একেবারে মূলকেন্দ্রে কোথায় বুঝি আছে একটা অর্থহীন জড়তা, একটা মূঢ় আনুগত্য। তাই একবার যা সুরু করে, তার থেকে ফেরাতে পারে না নিজেকে। গ্রহনক্ষত্রের অলাতচক্রের মতো আপনার চারিদিকে রচনা করে একটা দুর্ভেদ্য চক্র, আর আবর্তিত হতে থাকে তাকেই কেন্দ্র করে। হতভাগা লোকটারও ঘটেছে সেই অবস্থা।

একবার বুঝি কে ওর চৈতন্যের দরজায় ঘা মেরে বলেছিলো—'পালা পালা···এখান থেকে অনেক দূরে। না পালালে তোর রক্ষা

নেই—' সেইটুকু শুনেই সেই যে ধরেছে পালানোর নেশা, তা' থেকে ওর আর মুক্তি নেই।

সেই নেশার বিষে বাকী চৈতন্য সব অসাড় হয়ে গেছে, মগ্ন হয়ে গেছে নিজের মধ্যে। বহির্জগৎ ওর কাছে লুপ্ত। মনের মধ্যে শুধু একটি মাত্র শব্দ অনাহত সুরে ধ্বনিত হয়ে চলেছে—'পালাতে হবে, এখান থেকে অনেক দূরে'!

কোনখান থেকে সে দূরত্বর সীমারেখা তা জানে না সে, তাই হয়তো কখনো দীর্ঘ পনেরোটা দিন ধরে পালিয়ে বেড়ায় একটা জায়গাকেই কেন্দ্র করে। কোথাও পায় আশ্রয়, কোথাও একটু প্রীতির স্পর্শ পেয়ে বিগলিত হয়, আবার—যখন কোথাও জোটে অপমান লাঞ্ছনা সন্দেহ, তখন মাথা হেঁট করে চলে যায়।

এ কি সেই মানুষটা?

এই কিছুদিন আগেও যার উদাত্ত কণ্ঠের গান পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে বুঝি আকাশে উঠতো, যার হাসির আলোয় অনেকখানি জায়গা আলোকিত হয়ে উঠতো, নিতান্ত শিশুর মতোই যে অবোধ লোকটা জানতো না—পৃথিবীতে ঘৃণা আছে, হিংসা আছে, সন্দেহ আছে। এই আবরণটার মধ্যে এখন কি আর চেনা যায় তাঁকে?

ধূলিধূসর দেহ, রুক্ষ মাথা, কালি মাড়া তামাটে রং, কখনো খায় কখনো খায় না। একবার একটা চায়ের দোকানে কিছুদিন কাজ করেছিলো, তারা দিয়েছিলো দুটো কাপড় জামা, সেগুলোও কাচার অভাবে মলিন।

কাজের ইতিহাস অদ্ভুত। তখনো চেহারায় লাগেনি এতটা রুক্ষতার ছাপ।

দোকানের ধারে বসেছিলো, মালিক বললো—এই কাজ করবি?

গৌরাঙ্গ মাথা নাড়লো উদাসভাবে।

—না কেন, কর্ না?

—ইচ্ছে নেই।

—তা থাকবে কেন? খেটে খাবার ইচ্ছে আর জগতে ক'টা আহাম্মুকের থাকে! বলি চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে সাত দিন পেটে দানাপানি পড়েনি, কাজ করবি না কেন? কর না, খেতে পাবি।

চতুর লোকটা ভাবছিলো—পাগলা পাগলা ধরণের লোকটাকে দিয়ে শুধু খাওয়ার বিনিময়ে পুরো খাটিয়ে নেওয়া যাবে। তাই উদারতার ভান করে বলেছিলো—নে আয়, আজ আর কিছু কাজ করতে হবে না। অমনি খেতে পাবি। কাল সকাল থেকে কাজে লাগবি বুঝেছিস? আজ বরং কাপড়চোপড় ধুয়ে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে নে। দাড়ি গজিয়েছে দেখো ব্যাটার—যেন মা মরেছে! নে চারটে পয়সা নে, ওই ওখানে মোড়ের মাথায় নাপিত বসে আছে, যা দাড়িটা কামিয়ে আয়।...ও বাবা, এ যে দেখি জাত কেউটে—গলায় পৈতের গোছা! ভালো ভালো!

ওকে দাড়ি কামাতে পাঠিয়ে মালিক অনেক আকাশ কুসুমের স্বপ্ন দেখেছিলো। চাকরের কাজ তো করবেই লোকটা, তাছাড়া—এই যে নিত্য গণেশ পূজার জন্য পূজারী রাখতে হয়েছে মাস মাইনে তিন তিনটে টাকা দিয়ে, সেটাও তো একে দিয়ে বাঁচানো যায়।

তাছাড়া বৃহস্পতিবারে বৃহস্পতিবারে বাড়ীতে গিন্নীর লক্ষ্মীপূজোর জন্যে পাড়ার পুরোহিতের বরাদ্দ আছে এক টাকা, বাঁচবে সেটাও।

এ ছাড়া—ফি বছর বাপের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়, বরাবর নিয়মটা মেনে আসছে, ফেলতে পারে না। একে বাড়ীতে রাখলে, ব্যস মস্ত একটা খরচের দায় থেকে অব্যাহতি। একেই খাওয়ার শেষে চারটে পয়সা ভোজন দক্ষিণা বলে ধরে দিলেই মিটে গেলো কাজ। খেতোই তো, একটা লোক কিছু আর দুটো পেট নিয়ে খেতে পারবে না!

এতোগুলি আশা নিয়ে প্রথম কটা দিন গৌরাঙ্গকে বেশ তোয়াজ করছিলো লোকটা, কিন্তু আশাভঙ্গ হতে বেশী দেরী হলো না তার।

প্রতি পদে ধরা পড়তে লাগলো গৌরাঙ্গর আনাড়ীত্ব। সেখান থেকে বিদায়। কি জানি কেন বিশেষ লাঞ্ছনা জোটেনি। হয়তো 'জাত কেউটে' বলেই।

এর পর এক ভদ্রলোকের বাড়ী পেয়েছিলো আশ্রয়। পৃথিবীতে অহেতুক স্নেহ একেবারে নেই, এমন তো হতে পারে না। পৃথিবীটা তাহলে টিকে আছে কিসের জোরে?

কিন্তু সেখানেও এলো ভয়।

একদিন কর্ত্তার এক হিতৈষী এসে বেপরোয়া গলা ছেড়ে বন্ধুকে সাবধান করলেন—বাড়ীতে তো জায়গা দিয়েছো হে, বলি ভালো করে খোঁজ খবর নিয়েছো? চেহারা দেখলে তো মনে হচ্ছে ফেরারী আসামী—

কর্ত্তা বললেন—না হে না! লোকটা অদ্ভুত সরল, ওর কথাবার্ত্তা শুনলেই বুঝতে পারবে···কয়ে দেখো।

তা' কয়ে আর দেখতে হলো না। কথা কইতে এসে তাঁরা দেখলেন খাঁচা শূন্য। অতঃপর একজন মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসলেন, আর অন্যজন খুঁজতে বসলেন—বাড়ী থেকে কিছু খোয়া গেছে কি না।

হঠাৎ একদিন ওকে দেখা গেলো বর্দ্ধমানে একটা 'পাইস হোটেলের' পিছনের দরজার কাছে যেন কার অপেক্ষায়। একটু পরেই দোর খুলে বেরিয়ে এলো হোটেলের ঠাকুর, হাতে তার কাঁসিতে করে এক প্রস্থ ভাত বাড়া।

ভাতটা হাতে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ঠাকুরটা বলে—আজ আর ভিতরে যাওয়া চলবে না, এখানেই কোথাও বসে খেয়ে নাও।

গৌরাঙ্গের প্রেতাত্মা!

তবু সে হতাশ হয়ে চারিদিকে তাকায়—সঙ্কীর্ণ গলি, আবর্জ্জনার স্তূপে নরককুণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ, অদূরেই একেবারে রাজরাস্তা।

—এখানে কোথায় খাবো? এখানে বসে খাওয়া যায়?

বামুন ঠাকুর গলা নামিয়ে বলে—তা' কি করবো? মাসের এখন শেষাশেষি, এই সময় কর্ত্তার 'ইন্নিস্‌পিকশানের' ধুম বাড়ে বুঝলে? সকাল থেকে এসে বসে আছে, রাতের আগে নড়বে না। আমার ওপর ওর সন্দেহ আছে কি না। একবার যদি টের পায়, তা'হলে তোমারও খাওয়া ঘুচবে, আমারও চাকরী ঘুচবে। নাও নাও, বসে পড়ো।

—এখানে বসতে পারবো না।

—নাও ঠেলা! আমি কি তোমার ভাত হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকবো? ঝি বেটি তেমনি শয়তান, জানতে পারলে রক্ষে নেই, একখুনি কর্ত্তার কান ভারী করবে। আজকের মতো খেয়ে নাওনা যা তা করে।

লোকটার মিনতিতে গৌরাঙ্গ আবার এদিকে তাকালো…নাঃ, অসম্ভব। কুটনোর খোসা, পচা মাছের আঁশ, রাশিকৃত পোড়া' কয়লা আর ছাই। এখানে খাওয়া? সে কি পথের কুকুর?

—ভাত নিয়ে যাও। আজ আর খাওয়া হবে না।

লোকটা ছটফট করছিলো, কাজেই আর অনুরোধ উপরোধ করলো না। ফিস্‌ফিস্ করে বললো—রাতের বেলা অন্ধকারের ছ্যাঁকে এসো তা'হলে—বুঝলে?

—আচ্ছা।

ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে ফিরে চলতে থাকে গৌরাঙ্গ, বামুন ঠাকুরটা একটুক্ষণ দরদের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পথের দিকে, হয়তো বা দরদের সঙ্গে মিশে আছে একটু সম্ভ্রম। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে দরজা বন্ধ করে দেয়।

পথের আলাপ, কিন্তু ওর কেমন একটা ধারণা হয়েছে লোকটা বড়ো লোকের ছেলে, রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। তাই তাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো হোটেলের রান্নাঘরে।

তদবধি কদিন ধরে চলেছিলো এই ব্যবস্থা।

খদ্দেরের ভীড় একটু কমলেই পিছনের এই দোরটা খুলে এদিক ওদিকে তাকায়, দেখে গৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো বা জঞ্জালের রাশি বাঁচিয়ে পায়চারী করছে। ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আবার ছেড়ে দেয়।

অবশ্য এ ব্যবস্থাটা কেবল মাত্র গৌরাঙ্গর জন্যই সৃষ্ট নয়। এই উপায়ে অনেক সময়ই অনেক দেশোয়ালী ভাইকে আপ্যায়ন করে সে।

কিন্তু কোন্ আকর্ষণে বর্দ্ধমান সহরে এসে আটকে গেছে গৌরাঙ্গ? কোথা দিয়ে কেমন ভাবে এসে পড়েছে সে কথা আর মনে নেই।

তবু অনেক দিন হয়ে গেলো রয়ে গেছে এখানে। কেন কে জানে। কে তাকে আটকে রেখেছে? হোটেল ঠাকুরের হৃদয়মাহাত্ম্য-মিশ্রিত নিশ্চিত অন্নের প্রলোভন, না আর কোনো অনিশ্চিত আশার প্রলোভন?

চায়ের দোকানের আনা কয়েক পয়সা রয়েছে হাতে, যে কোনো একটা ট্রেনে চড়ে বসলেই তো হয়। যতোদূর যাওয়া যায়।

বাসুলপুরের মাটি বাদে আর যে কোনো মাটিতে!

স্টেশনের পর স্টেশন—কাছাকাছি গ্রাম—গাড়ী খানিকটা চলেই যেন নিশ্বাস ছাড়ে—আবার ছোটে বাঁধা লাইন ধরে।

থার্ড ক্লাশ ট্রেনের একখানা কামরায় দেখা যাচ্ছে গৌরাঙ্গকে। লক্ষ্যহীন শূন্য দৃষ্টি। হঠাৎ কি ভেবে নেমে পড়লো একটা স্টেশনে। জিনিষ পত্রের বালাই নেই সঙ্গে, নামলেই হলো।

বাসুলপুর স্টেশনের সঙ্গে কোনো মিল নেই, তবু যেন সামনের দৃশ্যটা ঝাপসা হয়ে আসে···মনের মধ্যে ভেসে ওঠে···ছোট্ট একটি স্টেশন···এতোটুকু একটু টিনের শেড্···মলিন বিবর্ণ ছোট্ট বগী··· সাপের মতো আঁকা বাঁকা সরু এক জোড়া লাইন। সেই লাইন··· আপন পথ কেটে নিয়েছে···চাষীর চষা মাঠের মাঝখান দিয়ে···গৃহস্থ

ঘরের উঠোনের গা বাঁচিয়ে, 'গোলা' মরাইয়ের' কোল দিয়ে···সহুরে সভ্যতার হাওয়া লাগা কোনো গ্রামের চায়ের দোকান আর 'স্টেশনারী শপ্' এর সামনে দিয়ে।

চোখে কি জল আসে?

নয় তো সবই ঝাপসা হয়ে যায় কেন?

এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিক চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো গৌরাঙ্গ। কাষ্ঠ ফলকে আঁটা এদেশের নামটা যেন তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলো।

ত্রিবেণী!

ত্রিবেণী!

কোথায় শুনেছে গৌরাঙ্গ এ নাম? কবে? কার কাছে? শুনেছে? না দেখেছে? কাঠেরফলকে লেখা নয়, এক টুকরো কাগজে লেখা। যে কাগজের টুকরোটুকু আরো অনেক টুকরোয় রূপান্তরিত করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলো গৌরাঙ্গ!

এই ত্রিবেণী, কি সেই ত্রিবেণী না কি?

ত্রিবেণীতে গঙ্গা আছেন না? 'যোগেযাগে' স্নান করতে আসে না লোকে? কোথায় সেই গঙ্গা? কোন্ দিকে?

একজনকে জিগ্যেস করতেই সে হেসে উঠে একদিকে আঙুল দেখিয়ে চলে যায়।

—এই—এই—রিক্শওলা, থামাও থামাও!

গৌরাঙ্গ সরে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রায় ঘাড়ে এসে পড়া সাইকেল রিক্শখানার আরোহিণীর লক্ষ্য বস্তু যে গৌরাঙ্গই সন্দেহ থাকে না আর।

হ্যাঁ, আরোহিণী নেমে পড়েছে।

—এ কী, গৌরাঙ্গ ঠাকুর না? এ কী চেহারা হয়েছে? পালাচ্ছেন তো? স্বভাব আর বদলালো না দেখছি। আসুন! আসুন!

না, চিনতে ভুল হয় না।

সেই আঁটসাঁট জামা পরা মাজাঘসা তরুণী। বিশেষের মধ্যে পরণে গরদের ব্লাউস আর গরদের থান। রিকশর ভিতর ভিজে কাপড় আর গঙ্গাজলের ঘটি।

স্নান সেরে ফেরার মূর্ত্তি।

রিকশওলাটা ভারসাম্য রাখতে সাইকেলটাকে প্যাডেল করতে থাকে, একই জায়গায়। হাত বাড়িয়ে বলে অপর্ণা—আসুন শুনুন, আপত্তি চলবে না। নেহাৎ গাড়ীর মধ্যে উঠতে বলবো না, পাড়ার লোক চোখ বড়ো করে তাকাবে। তার চাইতে এটুকু হেঁটেই যাই চলুন। রিকশওলা, ওগুলো নিয়ে এগোও তুমি। চলুন ঠাকুর-মশাই, বেশী হাঁটতে হবে না, এই কাছেই বাড়ী।

গৌরাঙ্গ অবাক দৃষ্টিতে এই প্রগল্‌ভার পানে তাকিয়ে বলে—কার বাড়ী?

—কার আবার? অকারণে হেসে ওঠে অপর্ণা—আমারই বাড়ী। দাঁড়িয়ে পড়ছেন কেন? চলুন?

—আপনার বাড়ীতে হঠাৎ যাবো কেন?

—'কেন' সে কথা বাড়ী গেলে বলবো। মোটের উপর হাতে পেয়ে ছাড়ছি না আপনাকে। ব্রত সারলাম আমি, কতো আশা করে লোক পাঠালাম বাসুলপুরে, শুনলাম আপনি না কি নিরুদ্দেশ। আচ্ছা খেয়ালী মানুষ তো?

প্রতি কথার সঙ্গে হাসির ঝঙ্কার···সে হাসিতে যেন গানের মুর্চ্ছনা।

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করবার চোখ গৌরাঙ্গর নেই। তাছাড়া একটি কথা যে তার মস্তিষ্কের কোটরে হাতুড়ীর ঘা মেরেছে। তাই না এই রুদ্ধস্বর প্রশ্ন।

—লোক পাঠিয়েছিলেন বাসুলপুরে?

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। আপনাকে আর বাদলকে আনতে, অনেক অনুরোধ জানিয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম। তা—আমার কপালে—

দুই চোখ বিস্ফরিত করে প্রশ্ন করে গৌরাঙ্গ—কোথায় পাঠিয়ে-ছিলেন লোক?

—কি মুস্কিল।.. আমি কি ঠিকানা ভুলে গেছি? লোক পাঠিয়েছিলাম বাসুলপুরে—শশধর ঘোষালের বাড়ী!

—কক্‌খনো না! অসম্ভব!

—এই দেখুন, আচ্ছা পাগল তো আপনি! সম্ভব অসম্ভবের মীমাংসা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না। উঃ চেহারার কী হাল করেছেন, তাই ভাবছি!

—এই রিকশওলা, আর যাচ্ছিস কেন? থাম। আসুন ঠাকুর-মশাই।

প্রকাণ্ড একখানা সাবেকী অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়ীখানা।

বিরাট বাড়ী—কিন্তু শ্রীহীন—যেন ভগ্নদশার সোপানে এসে ঠেকেছে। দোতলায় সারিসারি খড়খড়ি দেওয়া জানলাগুলো প্রায় সবই বন্ধ। লোহার 'গুল্' বসানো ভারী সদর দরজাটার সামনে একটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান।

অপর্ণাকে দেখে আভূমি সেলাম করে রীতিমত প্রশ্নসূচক ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলো গৌরাঙ্গর দিকে।

গৌরাঙ্গ অবশ্য এ দৃষ্টি দেখলো না। সে তখন দরজার পাশের সিংহের মাথা বসানো স্তম্ভটার স্থাপত্যশিল্প দেখছিলো নিরীক্ষণ করে। আঙুলের টোকা দিয়ে দিয়ে দেখছিলো কতো দিনের পুরানো!

সেলামের উত্তরে সহাস্যে সেলাম ফিরিয়ে দিয়ে অপর্ণা চোখ টিপে গলা নামিয়ে বলে—হাম্‌কো গুরুজী হ্যায় মিশিরজী!

মিশিরজী সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়ে সরে দাঁড়ায়।

—আসুন! গুরু পুরুতকে আহ্বান করার মতোই নিতান্ত নম্রভাবে ডেকে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ে অপর্ণা, আর বুঝি মন্ত্রাহতের মতোই তার অনুসরণ করে গৌরাঙ্গ।

ভিতর বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠোনও তেমনি নির্জ্জন শ্রীহীন। মানুষের সাড়া পেয়ে ঝট্‌পট্‌ করে উড়ে গেলো গোটা কতক পায়রা।

রিকশওলাটা উঠোনের পাশের উঁচু রোয়াকের উপর বসিয়ে দিয়ে গেলো গঙ্গাজলের ঘটিটা আর অপর্ণার ভিজে কাপড় গামছা।

এই বিরাট নিস্তব্ধতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ প্রায় বিরক্ত ভাবে বলে—এখানে আনলেন কেন আমাকে?

এই বিরক্তি প্রকাশে অপর্ণার চপলতা চটুলতা যেন একটু স্তিমিত হয়ে যায়। ম্লান বিষন্ন একটি দৃষ্টি তুলে বলে—গরীবের বাড়ীতে কি বামুন গোঁসাইয়ের একবার পায়ের ধূলোও দিতে নেই ঠাকুর? শুদ্দুর বাড়ীতে অন্নগ্রহণে আপত্তি নেই তো ঠাকুরমশাইয়ের?

চঞ্চল চোখের তারায় হাসির আলো ঠিকরে ওঠে অপর্ণার। সেই হাসির আলো এসে ছড়িয়ে পড়ে ঠোঁটের কোণায়, কথার ঝিলিকে। —পরে একটা না হয় প্রায়শ্চিত্ত করে নেবেন, কি বলুন?

গৌরাঙ্গ একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উদাস গভীর কণ্ঠে বলে—কারো অন্নগ্রহণে কাউকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না বুঝলেন? যদি সে অন্নের সঙ্গে মিশোনো থাকে অন্তরের স্নেহ।

কথাটা শুনে পলকের জন্য অপর্ণার চঞ্চলতা ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার হেসে বলে—স্নেহ মমতা ভক্তি শ্রদ্ধা, এ সবেরও যে 'বামুন-শুদ্দুর' আছে গো ঠাকুরমশাই! সবাইয়ের ভক্তি শ্রদ্ধাই কি সবাইয়ের নেবার যুগ্যি?

—আমার কাছে অতো জাত বিচার নেই!—বলে অপর্ণার পিছন পিছন ভিতরে ঢোকে গৌরাঙ্গ।

অপর্ণা ব্যস্তভাবে দালানের জানলায় মুখ রেখে বলে—বামুনদি ঠাকুরমশাইয়ের দুধটা গরম করে আনো।

—দুধ? কেন, দুধ কেন? গৌরাঙ্গ ব্যস্তভাবে বলে—ও সব আমার চাই না। বারণ করে দিন।

—আপনার চাই না, আমার চাই। অপর্ণা বলে—আমার কতো ভাগ্যে আপনাকে পেয়েছি।

—ভাগ্য। হুঁঃ। ভাগ্যই বটে। সব কথা জানলে আর এ কথা বলতে হতো না।—বলে ভাতে হাত দেয় গৌরাঙ্গ।

—আমাকে এবার ছেড়ে দিন—আহারের পর প্রস্থানোদ্যত গৌরাঙ্গ অপর্ণার মুখের দিকে মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—অনেক যত্ন করলেন, চিরদিন মনে থাকবে। এবার যাই ?

এবার যাই।

অপর্ণা কি জানতো না, গৌরাঙ্গ বিদায় চাইবে ? তবে অমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে কেন ? কেন হৃদয়ের শতবাহু প্রসারিত করে তার পথ আগলাতে চায় ? কেমন করে আটকানো যাবে ? অন্তত আর দুটো দিন।

তাড়াতাড়ি যা মনে আসে বলে—আজকেই চলে যাবেন ঠাকুর ? আমি যে বড়ো আশা করছি—আপনি একটি দিন আমার রাধাবল্লভের মন্দিরে কীর্ত্তন গাইবেন।

—কীর্ত্তন ? গৌরাঙ্গ যেন চমকে ওঠে, তারপর প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলে—না না। ওসব আর আমাকে দিয়ে হবে না। আমি পারবো না, আমি ভুলে গেছি।

গৌরাঙ্গর কণ্ঠে এক অসহায় ব্যাকুলতা।

অপর্ণা কাতর কণ্ঠে বলে—গান আপনি ভুলে গেছেন, এ কথা বিশ্বাস করবো কেমন করে ঠাকুর ? আমি যে সে জিনিষ দেখেছি। আহা সে কী রূপ! দোতলায় চিকের আড়াল থেকে দেখছি···মনে হলো বুঝি স্বর্গের দেবতা মর্ত্তে নেমে এসেছেন।

আত্মবিস্মৃত অপর্ণা যেন স্মৃতির অভিসারে যাত্রা করে। বিহ্বল

ভাবে বলে—সেই যে দেখলাম, আর তো ভুলতে পারলাম না, সে ছবি যে পাথরের গায়ে কেটে বসলো।

গৌরাঙ্গ এই বিহ্বলতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, বিস্মিত ভাবে বলে—কি বলছেন ?

—না কিছু বলিনি, আত্মসংবরণ করে নেয় অপর্ণা। বলে—শুধু বলছি আর দুটো দিন থেকে যান ঠাকুর। আমি আর একবার সেই গান শুনি, একবার আমার রাধাবল্লভকে শোনাই সে গান।

গৌরাঙ্গ বিব্রত ভাবে বলে—দেখুন—শুনুন, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, মানে ব্যাপারটা তো আপনি জানেন না। থাকবার আমার উপায় নেই।

অপর্ণা এবার অন্য অর্থ ধরে, তাই ম্লান মুখে বলে—কেন উপায় নেই ঠাকুর ? আমাকে না হয় আপনার ঘৃণা হয়, কিন্তু রাধাবল্লভ ? তিনি তো শুধু আমার ঠাকুর নয়, তিনি আমার শ্বশুরবাড়ীর কুল-দেবতা।

—ঘৃণা। গৌরাঙ্গ বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে—আপনি কিছু জানেন না তাই বলছেন, কোনো কারণেই কাউকে ঘৃণা করবার অধিকার আমার নেই, বুঝলেন ? আমি হতভাগ্যই বিশ্বের ঘৃণার পাত্র। এই আপনিই যদি আমার ইতিহাস শোনেন তো ঘৃণায় শিউরে উঠে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইতেন।

—আমি ? আমি আপনাকে ?

বিস্ফারিত চক্ষে তাকায় অপর্ণা, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলে—এমন কথা শুধু আপনার মতো ক্ষ্যাপা মানুষেরই বলা সম্ভব ঠাকুর-মশাই।

গৌরাঙ্গ একটু ইতস্ততঃ করে বলে—আমি তো ক্ষ্যাপা, কিন্তু আপনিই বা কোন্ বুদ্ধিমান ? জিগ্যেস নেই পত্তর নেই, এই যে আমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে একেবারে বাড়ীর মধ্যে তুললেন, এতে আপনার বিপদ হতে পারে কি না ভেবে দেখেছেন ?

এ বাড়ীতে বোধহয় বেটাছেলে কেউ নেই, তাই এমন কাজ করতে পারলেন! থাকলে—

—থাকলে রক্ষে রাখতো না কেমন? অপর্ণা মুখটিপে হেসে বলে—ভাগ্যিস নেই, তাইতো এতো দুঃসাহস! কিন্তু কথা দিন ঠাকুর, আর দুটো দিন থেকে যাবেন?

গৌরাঙ্গ স্থির স্বরে বলে—আর যদি সেই ফাঁকে পুলিশ এসে আপনার বাড়ী হানা দেয়?

—পুলিশ? পুলিশ কেন?

—তবে আর বলছি কি? গৌরাঙ্গ ক্ষুব্ধ হাসি হাসে—পুলিশ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অপর্ণা কিন্তু এ হেন সংবাদেও বিচলিত হয় না। রহস্যের বাঁকা হাসি হেসে বলে—কেন বলুন তো ঠাকুর? গান শুনিয়েছিলেন বুঝি কখনো?

গৌরাঙ্গ সহসা যেন পূর্ব অভ্যাসে ফিরে যায়, স্বভাবগত ধমকের স্বরে বলে—এই! এই হলো মেয়েলি ছেলেমানুষী! হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর কথা, সুরু হলো তামাসা! বলি, কেন যে আমি ঘর ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তা জানেন?

অপর্ণা তেমনই রহস্যের বাঁকা হাসি হেসে ভালোমানুষের মতো বলে—কি জানি! কে ঘরছাড়া করলো বলুন তো? আমি নয় তো?

—আঃ! গৌরাঙ্গ চটে উঠে বলে বসে—আসল কথা শুনলে হাসি বেরিয়ে যাবে! খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি বুঝলেন? খুন! চান আরো কিছু শুনতে?

—খুন? আপনি খুন—?

মুহূর্তের জন্য একবার চমকে ওঠে অপর্ণা, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই হেসে ওঠে, বাঁধনছাড়া খিলখিল হাসি! থামতেই চায় না সে হাসি।

যেন এতো বড়ো কৌতুকের কথায় একটু হাসি যথেষ্ট নয়।

সমস্ত শুনে নিঃশ্বাস ফেলে বলে অপর্ণা—বৈকুণ্ঠের নারায়ণ এসেও যদি আমায় বলেন, তুমি মানুষ খুন করেছো ঠাকুর, সে কথা আমি বিশ্বাস করবো না। (কোন অসতর্কতায় 'আপনি' পরিণত হয়েছে 'তুমি' তে।)

—করবেন না? গৌরাঙ্গ ব্যগ্রভাবে বলে—সত্যি বলছেন বিশ্বাস করবেন না?

—না।

—কিন্তু কেন?

—এর আর কোনো 'কেন' নেই ঠাকুর। যা হয় না, হতে পারে না, তা কেমন করে হবে?

গৌরাঙ্গ হতাশভাবে বলে—কিন্তু আমি যে সত্যিই খুন করেছি!

—ঠাকুর, বুঝেছি তুমি ওই বলে ভয় দেখিয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে পালাতে চাও। কিন্তু ওতে আমাকে ভোলাতে পারবে না। বলো তো ঠাকুর, তোমার মতো লোকের হঠাৎ মানুষ খুন করার দরকারটা হলো কেন? আর কি করেই বা করলে?

গৌরাঙ্গ বিহ্বল ভাবে বলে—কি করে? তা তো জানি না। কি করে যে কি হলো, তা তো কিছুই জানি না। ওরা বললো 'খুন হয়েছে,' মাষ্টারমশাই বললেন 'পালাও'। আর কিছু জানি না। নাঃ আর কিছু মনে পড়ে না।

—কিন্তু তুমি যে বললে ঠাকুর পুলিশ তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ কি সত্যি?

—সত্যি নয়? বাঃ!—গৌরাঙ্গ নিশ্চিত সুরে বলে—একটা জলজ্যান্ত মানুষ খুন হয়ে গেলো আর পুলিশের হুলিয়া হবে না?

গৌরাঙ্গর এই কথায় অপর্ণার মুখটা অমন জ্বলে ওঠে কেন? আনন্দের দীপ্তিতে। এই ভীতিকর সংবাদটার মধ্যে কোথায় লুকোনো আছে ওর আনন্দের উপাদান?

—তাই যদি হয় ঠাকুর, কেন তুমি পালাবার জন্য অমন ছটফট করছো ? আমার এই তিন মহলা পুরী শূন্য পড়ে আছে, এখানে থাকো না ? এখানে পুলিশ পাহারাওলা জন্মেও উঁকি দিতে আসবে না।

—এখানে ? এখানে থাকবো আমি ? পাগল না ক্ষ্যাপা আপনি ?

অপর্ণা মনে মনে বলে, ছিলাম না, তুমি করেছো। মুখে বলে—এতে এতো অবাক হবার কি আছে ঠাকুর ? তোমায় তো আমি মনেপ্রাণে গুরু বলে স্বীকার করেছি, গুরু কি শিষ্যবাড়ী থাকে না ?

—কি মুস্কিল। আপনার বাড়ীতে কেউ নেই, কিছু না।

—কেউ নেই সে কি আমার অপরাধ ঠাকুর ? ভগবান আমায় বঞ্চিত করেছে বলে কি কারো এক কণা দয়া পাবারও প্রত্যাশা করতে পারি না আমি ? একটা বিরাট শূন্য পুরীতে দিন কাটে আমার শুধু গোটাকতক দাসী নিয়ে। এই হাহাকার-ভরা প্রাণের উপর তোমার গান এসে যেন চন্দনের প্রলেপ দেয়। এটুকুও কি আমি পৃথিবীর কাছে চাইতে পারি না ঠাকুর ? এই যে পৃথিবী, হাসি গান, সাধ আহ্লাদ, মিলন ভালোবাসার পসরা সাজিয়ে বসে আছে, এর ওপর কোনো অধিকারই আমার থাকতে নেই ? বলতে পারো, কী আমার অপরাধ ? একটা মানুষ অকালে চলে গেছে, তার জন্যে কি আমি দায়ী ? তাই এই ভরা বয়সে আমি—

—ছিঃ।—গৌরাঙ্গ বিরক্ত স্বরে বলে—হিন্দুর মেয়ের ওসব কথা ভাবতে নেই।

—ভাবতে নেই। অপর্ণা সহসা হেসে ওঠে। হেসে বলে—ভাবাটা কি মানুষের নিজের হাতে ? ভাবনার ওপর জোর চলে ? এতো বড়ো নিঃসঙ্গ দিন রাত্রিগুলো তো কাটে আমার শুধু ভাবনাকে সঙ্গী করে। বলতে পারো ঠাকুর, কেন পুরুষের কিছুতেই দোষ নেই, মেয়েদের শুধু চিন্তাও অপরাধ ? তুমি কি জানো ঠাকুর, কি করে কেটেছে আমার জীবন ? কম বয়সে বিয়ে হলো, রূপের কান্তি

স্বামী। সেই নতুন প্রাণে প্রেম এলো বন্যার মতো···কিন্তু···কিন্তু··· কুসুমে ছিলো কীট···কন্দর্প কান্তির অন্তরালে এক ভয়ঙ্কর জানোয়ার! উঃ। না···না···ঠাকুর তুমি দেবতা, তুমি জানো না, মানুষের চামড়ার আড়ালে কী ভয়ানক জানোয়ার বাস করতে পারে! হ্যাঁ সে, মরে আমায় নিস্কৃতি দিয়েছে, এর জন্যে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। তা নইলে আমাকেই মরতে হতো! কিন্তু বলো তো ঠাকুর, বন্যার মতো দুকুল ভাসিয়ে যে এলো, সে কেন মরে গেলো না? সে কেন শুকিয়ে গেলো না?

গৌরাঙ্গ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—দেখুন আমি মুখ্যু গাঁইয়া মানুষ, আমি এসব কথা ঠিক বুঝতে পারি না। আমায় আপনি যেতে অনুমতি দিন। পুলিশের ভয়ে আপনার বাড়ীতে লুকিয়ে থেকে আমি স্বস্তি শান্তি কিছুই পাবো না।

—বুঝেছি ঠাকুর, তুমি বরাবরই আমায় ঘৃণা করো! কিন্তু একটা আর্জি করি, সামনের এই ঝুলন পূর্ণিমার দিনটা অবধি থাকো। সেদিন আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা, এমন কতো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধুসন্ত তো আসবেন!

—ঝুলন পূর্ণিমা? গৌরাঙ্গ চিন্তিতভাবে বলে—তার আর কতো দেরী?

—এই দিন দশ বারো।

—ঝুলন পূর্ণিমা! ওই দিনে আমাদের যাত্রা পার্টি খোলবার দিন ঠিক ছিলো।

অসহায় স্বরে বলে গৌরাঙ্গ।

ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকায় অপর্ণা। তারপর বলে—তুমি যদি থাকতে ঠাকুর, তোমার সব কিছুই করে দিয়ে ধন্য হতাম আমি।

অনুরোধে পাহাড় টলে।

গৌরাঙ্গ স্বীকৃত হয় ঝুলন অবধি থাকতে।

অপর্ণার জীবনে এ যেন এক মহোৎসব।

তার রাধাবল্লভের ঘরে রোজই উপচারের ঘটা, রোজই বিশেষ আয়োজনের পূজা। কাজেই কীর্ত্তন চাই।

বোধকরি পলায়নোন্মুখকে ধরে রাখবার এ এক কৌশল।

এরই ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে আপনাকে বিলিয়ে দিতে থাকে অপর্ণা সেবায় আর সমাদরে।

—উঃ বাঁচলাম বাবা। আর্শী দিয়ে একবার দেখ তো ঠাকুর, এইবার নিজেকে চিনতে পারছো কি না? দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে মুখের কী চেহারাই করে রেখেছিলে।

গৌরাঙ্গ অজ্ঞাতসারে একবার নিজের সদ্য ক্ষৌরীকৃত মসৃণ গালে হাত বুলিয়ে মৃদু হেসে বলে—তবুও তো চিনতে পেরেছিলেন।

—পেরেছিলাম, সে শুধু—না থাক। সে কথা শুনলে আবার গোঁসাইঠাকুরের গোঁসা হবে। আজ আমি তোমায় নিজে হাতে সাজাবো ঠাকুর, কপালে দেবো চন্দন তিলক, গলায় রজনীগন্ধার মালা, পরণে পট্টবাস, মাথায়—(আপন ভোলা সুরে উচ্চারণ করতে থাকে অপর্ণা।)

—আপনার নিজের মাথায় কবরেজী তেল মাখুন। মাথার কিছু দোষ আছে বোধহয়!—বলে উঠে দাঁড়ায় গৌরাঙ্গ।

ক্ষণে ক্ষণে এই ভাবেই চলে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব।

অপর্ণা ভোগের প্রসাদের থালাসুদ্ধ এনে সামনে ধরে বলে—ঠাকুর খাও।

গৌরাঙ্গ বিরক্ত হয়ে ঠেলে দিয়ে বলে—ঠাকুর যে একটি রাক্ষস, এ খবর আপনাকে কে দিলে? এই এক থালা সন্দেশ মানুষ খেতে পারে?

কখনো কখনো বলে—আপনার যত্নের ঠেলায় ঝুলনের আগেই পালাতে হবে আমাকে। উঃ এ তো যত্ন নয়, শাস্তি দেওয়া।

ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে অপর্ণা, ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে যায় সরবতের গ্লাস, কি মুখকাটা ডাবটা।

তখন আবার মমতা হয় গৌরাঙ্গর, হাঁক দিয়ে বলে—দিন দিন! অসময়ে ডাব খেয়ে সান্নিপাতিক ধরাই, সেও ভালো। যা একখানি মুখ করে চলে যাচ্ছেন।

কিন্তু হাস্য-পরিহাসের কাটা খাল দিয়েই তো আসে অসতর্কতার কুমীর।

কাল ঝুলন পূর্ণিমা।

আনন্দ আর বিষাদের ভরাপাত্র নিয়ে অপর্ণার কাছে উপস্থিত হচ্ছে আগামী দিনটি। কালকে পরমোৎসব রাত্তি, তাই এই আনন্দ। অপর্ণার শ্বশুরের আমলের 'রাধাবল্লভ' এতোদিন ছিলেন বাড়ীর ঠাকুর ঘরে, অপর্ণা তাঁর জন্য মন্দির নির্মান করেছে। কাল তার প্রতিষ্ঠা উৎসব।

গন্ধে মাল্যে ধূপে চন্দনে আয়োজন উপচারে মন্দির ভরপুর হয়ে উঠবে কাল দেবতার আগমনে।

আবার কালই বুঝি শূন্য হয়ে যাবে আর এক মন্দির। কালই বুঝি গৌরাঙ্গর বিদায়ের দিন।

আর কোন্ ছুতোয় আটকে রাখা যাবে তাকে?

মন্দিরের ভিতরের মালা সজ্জার ভার নিয়েছিলো গৌরাঙ্গ। ফুলের মালা পাতার মালা আর চাঁদমালা। দেয়ালে দেয়ালে মালার কারিগরি।

এই উৎসব উপলক্ষে গৌরাঙ্গও বুঝি ভুলে গেছে সে একটা পলাতক আসামী। মুখে তার তৃপ্তির আভাস।

সহসা শোঁ শোঁ আওয়াজ করে কোথা থেকে ছুটে এলো ঝড়।

দুমদাম করে বন্ধ হয়ে গেলো জানলার কপাট, গাছের সারি লুটোপুটি খেতে লাগলো মাথা হেঁট করে করে, ছন্নছাড়া হয়ে গেলো এতোক্ষণের মালাসজ্জা, তারপরই নামলো প্রবল বৃষ্টি।

শ্রাবণের প্রবল বর্ষণ···মুহূর্তে প্লাবন বইয়ে দিতে চায়।

মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে নাটমন্দিরে গিয়ে বসলো গৌরাঙ্গ। ঝড় বৃষ্টির মাতামাতি দেখতে পাওয়া যায় এখান থেকে। এ রকম বৃষ্টি একদিন মাথার উপর দিয়ে গিয়েছিলো, মাথা বাঁচাতে এতোটুকু আশ্রয় পায়নি। আজ তার কী চমৎকার সুচারু আশ্রয়!

হঠাৎ বাড়ীর ভিতরের দালান দিয়ে পিছন থেকে অপর্ণা এসে দাঁড়ায়। হাতে তার একটা পুষ্পপাত্র।

প্রায় ধ্যানমগ্ন মানুষটার পিছনে দাঁড়িয়ে ধীর স্বরে ডাকলো—ঠাকুরমশাই!

চমকে তাকালো গৌরাঙ্গ।

অপর্ণা নাটমন্দিরের থামের নীচের বেদীতে বসে পড়ে বললো—সাজানো হলো?

—হলো একরকম।

—অনেকক্ষণ তো খাটলে, বোসো না।

গৌরাঙ্গ বিব্রত ভাবে তাকিয়ে বলে—এখানে কোথায় বসবো?

অপর্ণা কি আজ বেপরোয়া? তাই নিজের পাশের সংকীর্ণ স্থানটুকু দেখিয়ে বলে—একটু কাছাকাছি বসলেও কি জাত যায় ঠাকুর?

—আপনার কথাবার্তা আমার ভালো লাগে না—বিরক্ত ভাবে বলে গৌরাঙ্গ।

আহত ভাবে উঠে দাঁড়ায় অপর্ণা, সহসা গৌরাঙ্গর একটা হাত চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে—কেন ভালো লাগেনা বলতে পারো ঠাকুর?

রাধারাণীর বিরহ-অশ্রুতে তোমার বুক ভাসে, পরকীয়া প্রেমের ভাবে তুমি আত্মহারা, শুধু—

—থামুন। পরকীয়া প্রেম। বৈষ্ণবের পরকীয়া প্রেমের মানে জানেন? আমার সঙ্গে আপনার, মানুষের সঙ্গে মানুষের আসক্তিকে পরকীয়া প্রেম বলে না। সে স্বর্গীয় জিনিষ বোঝবার ক্ষমতা আপনার নেই।—হাতটা ছাড়িয়ে নেয় গৌরাঙ্গ।

কিন্তু অপর্ণা বুঝি আজ মরীয়া।

তাই ফণিনীর মতো ঘাড় তুলে দৃপ্তকণ্ঠে বলে—মানুষের প্রেমই কি তুচ্ছ করবার জিনিষ ঠাকুর? এও স্বর্গ থেকে আসে। মানুষের মধ্যে শুধু আসক্তিই থাকে না, ত্যাগও থাকে। হ্যাঁ, তোমাকে আমি ভালোবেসেছি ঠাকুর, ভক্ত যেমন করে তার দেবতাকে ভালোবাসে—

—মা মা, আপনি এখানে?—নবনিযুক্ত একটা ঝি ছুঠে আসে—সদরে একটা খাকি কোট-পেন্টুল পরা বাবু হামলা করছে, বলছে—'ইনিসপেকটার' না কি, আপনাকে তার দরকার।

—'ইনসপেক্টর!' অপর্ণা আড়ষ্ট হয়ে একবার গৌরাঙ্গর মুখের দিকে তাকায়, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলে—আর কি বলছে?

—কিছু বলছে না, খালি বলছে 'তোমাদের গিন্নীমা কোথায়?

গৌরাঙ্গ একটু ক্ষুব্ধহাসি হেসে বলে—চলুন, এবার অতিথি-সেবার ফল ভোগ করবেন চলুন?

গৌরাঙ্গ দাসীটার অনুবর্ত্তী হতে উদ্যত হয়, আর অপর্ণা দাসীর উপস্থিতি ভুলে আবার ওর হাতটা চেপে ধরে ক্ষীণ চাপা সুরে বলে—না, ককখনো না। তোমার যাওয়া হতে পারে না। তুমি এই মন্দিরের পিছন দিয়ে আম বাগানের ওদিক ধরে চলে যাও স্টেশনে। যে গাড়ী পাবে উঠে পালাবে।

গৌরাঙ্গ আর একবার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—নাঃ। আর পালাবো না! পালিয়ে বেড়ানোর শেষ হোক এইবার।···তুমি যাও

গো বাছা, বলতে বলো গে তাঁকে। আঃ আর পথ আগলাবেন না। এ রকম করে পালিয়ে বেঁচে থাকবার ইচ্ছে আর নেই অপর্ণা দেবী। জীবনে কারো কোনো মঙ্গল করতে পারলাম না, দেখছি সকলের ক্ষতিই করছি! শেষ পর্য্যন্ত আপনারও ক্ষতি করলাম! বিধাতার বিধানের বিপরীত চলতে নেই। অপরাধীর সাজা হওয়া উচিত। খুনীর ফাঁসি হওয়াই ঠিক! পথ ছাড়ুন, আমাকে ধরা দিতে যেতে দিন!

অপর্ণার কাঁপতে থাকে হাত পা, কাঁপতে থাকে ঠোঁট। কি করে আটকাবে এই বিপদ!

হঠাৎ তীব্রকণ্ঠে বলে—খুব তো ধর্ম্মকথা বলছো ঠাকুর। তুমি ধরা দিলে আমার কি অবস্থা হবে ভাবছো কি? খুনী আসামীকে লুকিয়ে রাখলে, যে রাখে তার শাস্তি হয় না? তুমি কি আমাকে সবদিক থেকে মজাতে চাও?

কথাগুলো বলতে ঠোঁট কামড়ায় অপর্ণা।

কিন্তু ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। গৌরাঙ্গ সহসা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—ও তাই। যাক। 'ভক্ত ভগবানের' ব্যাপারটা মিটেছে তা হলে?

—আঃ! নিজের প্রাণ কে না বাঁচাতে চায়? যাও···যাও বলছি তুমি!

—আচ্ছা! তাই যাচ্ছি! আপনাকে বিপদে ফেলবো না—গম্ভীর কণ্ঠে বলে গৌরাঙ্গ—পৃথিবীতে পালাবার পথ বেশী নেই বটে, তবে ধরা দেবার পথ অনেক আছে! ফাঁসি না যাওয়া পর্য্যন্ত স্বস্তি নেই আমার।

ধীরে ধীরে চলে যায় গৌরাঙ্গ অপর্ণার নির্দেশিত মন্দিরের পিছনের পথ ধরে। যেতে গিয়ে বারে বারে বাধা পায় বৃষ্টির ঝাপটে, তবু এগোয়।

ঝিটা আবার ছুটে আসে—অ মা, কতো দেরী করছো? লোকটা যে মহা ঝামেলা লাগিয়েছে।

অপর্ণা নীরবে তার পশ্চাদনুসরণ করে। শুধু ভাবতে ভাবতে যায় কোন্ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে। কি ভাবে সেই লোকটাকে কথার জালে আটকে রেখে, গৌরাঙ্গকে পালাবার সুযোগ দেবে।

কিন্তু এ কী? অপর্ণার জন্য কি এই অদৃষ্টের পরিহাস তোলা ছিলো? অপর্ণাকে দূর থেকে দেখেই ঝি-বর্ণিত 'ইনিসপেকটর' হৈ হৈ করে ওঠেন—এই দেখ অপু, তোর এই ঝি মাগীটা আমাকে প্রায় তাড়িয়েই দিচ্ছিলো, বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছিলো না। কি রকম সব লোক রেখেছিস?

—ছোটকাকা আপনি?

দালানে সিঁড়ির ধাপের উপর বসে পড়ে অপর্ণা।

ভদ্রলোক বিপন্ন মুখে বলেন—আমিই তো। তা' তুই অমন ঘাবড়ে গেলি কেন? অতো ঘটা করে পত্তর দিয়েছিলি 'কাকা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো, আসা চাই', ভুলে গেছিস না কি? আমি কিন্তু দেখ একমাস আগের সেই চিঠিটি মনে রেখে—অবিশ্যি মিথ্যে বলবো না, এদিকে একটা ইন্‌সপেকশনের কাজও পড়েছিলো— এ কি! এ কি! কি হলো? ঝি! ঝি! জল, একটু জল! পাখা, পাখা! কি ব্যাপার! খুব উপোস টুপোস চালাচ্ছে বুঝি?

—লড়তে হবে বৈ কি! অপর্ণার কাকা জোর দিয়ে বলেন—তুই যখন তার কাছে দীক্ষা নিয়েছিস, তোর যখন গুরু, তখন তার হয়ে লড়তেই হবে। টাকা ঢাললেই কেস্ জেতা যায়, বুঝলি অপু? বিশেষ করে তুই যখন বলছিস সে নির্দ্দোষ।

—সে কথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ছোটকাকা।

—তবে তো কথাই নেই। টাকা কড়ি আছে তাঁর?

—টাকা? হ্যাঁ কাকা, অনেক টাকা আছে তাঁর, অনেক টাকা।

—ব্যস! ব্যস! তবে তো হয়েই গেলো! এমন কোনো অপরাধ নেই যা টাকায় মেটে না, বুঝলি? আর এ তো—তুই ভাবিসনি ঠিক জিতে যাবে! গুরুটুরুদের টাকার আণ্ডিল থাকে, আর চেলা চামুণ্ডোও বিলক্ষণ থাকে।···উঃ এ বৃষ্টি যে রীতিমতো চেপে এলো। ভাগ্যিস পথ থেকে ঘরে উঠে পড়েছি!

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই উঠে পাশের ঘরে চলে গেছে অপর্ণা। বিদ্যুৎবেগে খুলতে লেগেছে বাক্স, দেরাজ, লোহার আলমারী। নগদ টাকা যতো ছিলো সব নিয়েও মন ওঠে না, লোহার সিন্ধুক খুলে বার করে হার বালা তাবিজ বাজু ব্রেসলেট! পথ থেকে ঘরে উঠতে পেরেছেন বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন ছোটকাকা, আর এই ভয়ঙ্কর সময় অপর্ণা তাকে বার করে দিয়েছে ঘর থেকে পথে।

এখুনি ছুটতে হবে সেই বিতাড়িতের পিছন পিছন, যার বিপদের আশঙ্কায় মিথ্যা ভয়ে ভীত হয়ে এই দুর্যোগের মুহূর্তে 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দিয়েছে অপর্ণা। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে নিজেই বিলম্ব ঘটিয়ে ফেলেছে সে, এখন কতো ছুটলে তার নাগাল পাওয়া যাবে? সেই নিষ্ঠুর নির্মায়িক লোকটা যদি অপর্ণা তার নাগাল পাবার আগেই নিজেকে ধরিয়ে দেয় পুলিশের হাতে?

তা হলে কি করবে অপর্ণা, কি করবে?

হে ভগবান, রক্ষা করো!

মানুষের চাইতে বুঝি জন্তুও ভালো।

একটা পড়ো বাড়ীর গহ্বরে বসে, বর্ষণক্লান্ত মেঘমেদুর আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে এই দার্শনিক চিন্তাটি করছিলো গৌরাঙ্গ। এই পড়ো বাড়ীটার প্রথম আগন্তুক ছিলো একটা ভেজা কুকুর। দুটো পায়ের মাঝখানে মাথাটা গুঁজে সে ঝিমোচ্ছিলো।

গৌরাঙ্গ যখন ঢুকেছে, ও অলস দৃষ্টি মেলে একবার দেখে নিয়েই চোখ বুজেছে, কোনো প্রতিবাদ করেনি। তারপর থেকে দুজনে স্থির হয়ে বসে আছে একই আচ্ছাদনের নীচে, কিন্তু বিরোধ ওঠেনি কোনো পক্ষ থেকেই।

—ধুত্তোর, ছাই পৃথিবী!

উদাসীন লোকটার স্তিমিত চোখে হঠাৎ যেন স্থির সংকল্পের আগুন জ্বলে ওঠে—এই হতচ্ছাড়া পৃথিবীটাতে পড়ে থাকবার জন্যে এতো চেষ্টা, এতো ঝুলোঝুলি? দূর দূর!

নাঃ এমন করে আর প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াবে না সে—শশধরের হত্যাকারীকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে তবে ছাড়বে।

অপর্ণার হৃদয়হীনতা যেন তার মূর্চ্ছিত চৈতন্যকে ধাক্কা দিয়ে সচেতন করে দিয়ে গেছে। এই গত ছয়মাসব্যাপী নিজের অস্নাত অভুক্ত আতঙ্কগ্রস্ত পালিয়ে বেড়ানো দীন মূর্ত্তি স্মরণ করে নিজেরই যেন ঘৃণা ধরে যাচ্ছে তার।

শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে এই দীনতা? এর কোনো অর্থ আছে? জেগে থাকলে শুধু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে আপনাকে লুকিয়ে রেখে রেখে দিনটাকে ক্ষয় করা, আর ঘুমোবার সুযোগ জুটলেই দুঃস্বপ্ন দিয়ে সে ঘুমের সুরু! ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন! মাথার উপরে চক্‌চকে একটা ধারালো অস্ত্র, আর পায়ের নীচে খানিকটা কালো রক্তের ধারা!

এখনো ভালো করে বুঝতে পারে না গৌরাঙ্গ, কার হাতে কে খুন হয়েছিলো সেদিন। শশধর খুন হয়েছিলো আর গৌরাঙ্গ বেঁচে আছে? মাঝে মাঝে নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখে গৌরাঙ্গ, নিজে সে ঠিক মতো বেঁচে আছে কি না!

বেঁচে আছি কি না অনুভব করতে চিম্‌টি কেটে কেটে প্রমাণ নেওয়া, এমন ঘৃণ্য জীবন বয়ে বেড়ানোর শেষ হোক এবার!

হয়তো এমনিই হয়।

মানুষের হৃদয়হীনতাই মানুষকে উদাসীন করে তোলে, দার্শনিক করে তোলে। মানুষের হৃদয়হীনতা শিশুকে প্রবীণ করে, নির্বোধকে বিজ্ঞ করে। অপর্ণার আজকের হৃদয়হীনতার অভিনয়টাও তাই গৌরাঙ্গর জড়ত্বপ্রাপ্ত মনকে দিয়ে গেছে চিন্তাশক্তি।

তাই—'ধূত্তোর, ছাই পৃথিবী' বলে উঠে দাঁড়ালো গৌরাঙ্গ।

কি ভেবে কুকুরটাকে একটু আদর করলো, তারপর পড়ো বাড়ীর ভাঙা ইঁটের স্তূপ ডিঙ্গিয়ে ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

মৌন আকাশ মেঘমলিন, বাতাসে এখনো আর্দ্র্তা, প্রচুর বর্ষণসিক্ত মাটির স্পর্শ লেগে সে বাতাস যেন আরো ভারী হয়ে উঠেছে।

চলতে চলতে সমস্ত প্রকৃতিটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো চলন্ত পথিক, আর একবার অবাক হয়ে ভাবলো···এই পৃথিবীতে ছুটো দিন বেশী থেকে যাবার জন্য মানুষের এতো মাথা কোটাকুটি! আশ্চর্য্য!

কিন্তু কদিনেরই বা কথা, যেদিন সে এমনি একা চলতে চলতে ভেবেছিলো···এই পৃথিবী, এই আলো, এই বাতাস এর মাঝখানে মানুষ আনন্দ খুঁজে পায়না কেন?

সিটি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলো।

শূন্য লাইনটা যেন সদ্য বিধবার সিঁথির মতো পড়ে রইলো দর্শকের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলতে। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর ইঞ্জিনের শব্দ যখন শেষ হয়ে যায়, শূন্য লাইনটা দেখে মনটা উদাস উদাস হয়ে যায়না এমন কেউ আছে?

বাসুলপুর স্টেশনে আধ মিনিট ট্রেন থামে।

দিনে রাতে দুবার ওর ডিউটি। রাত চারটে আর বেলা চারটেয়

আধ মিনিট করে এখানে থেমে আবার নিজের মদগর্ব্বিত চালটি বজায় রেখে অগ্রসর হয়ে যায় সে। দিনের গাড়ীটায় কোন দিন দু'চারজন ওঠে নামে, রাতের গাড়ীটায় লোক আসা যাওয়া দৈবাতের ঘটনা।

তবু বাস্থলপুর স্টেশনে ট্রেন আধ মিনিট থামে।

তবু শেষ রাতের ট্রেনটা চলে যাওয়ার পরই স্টেশন মাষ্টারমশাই রেল কোম্পানীর চারদিকে কাঁচ বসানো চৌকো আর ভারী একটা লণ্ঠন উঁচু করে তুলে ধরে কাকে যেন খুঁজে বেড়ান। দেখা জায়গা আবার দেখেন, মনে হয় অসতর্কে চোখ এড়িয়ে গেছে বুঝি। ঝুমকো জবা গাছের ছায়াটাকে বার বার মানুষ বলে ভুল করেন।

খুঁজতে খুঁজতে ভোরের আলো ফুটে ওঠে—পৃথিবী তার সমস্ত রহস্য হারিয়ে ফেলে। লণ্ঠনটাকে নিভিয়ে দিতে হয়।

কিন্তু তার সঙ্গেই কি নিভে যায় সমস্ত আশাব আলো? সব প্রতীক্ষার শেষ হয়ে যায়?

না, না, বিকেল চারটেব ট্রেন আসবার সময় যে বাদলকে নিয়ে দাঁড়াতে হবে।

এই এক নতুন ডিউটি হয়েছে মাষ্টারবাবুব।

বেলা তিনটে না বাজতেই বাদলকে তার বাড়ী থেকে নিয়ে আসা, তারপর মিনিটের পর মিনিট দু'টি অসমবয়সী বন্ধুব একই ব্যর্থ আশাব দুঃসহ প্রতীক্ষা। দূর থেকে সিটির শব্দ শোনা যায়—প্লাটফরমটা যেন কেঁপে ওঠে, ইঞ্জিনটা চোখ থেকে সরে যায়, দেখা দেয় ট্রেনের কামরা। চির পুরাতন তবু নিত্য নতুন। নিত্য নতুন আশার বাহক।

হয়তো আজ আসবে! হয়তো আজ আসতে পারে।

ট্রেন আসার আগে পর্য্যন্ত কথার খই ফোটে নবীন আর প্রবীণ দু'টি বক্তার মুখে। দু'জনেই বক্তা, দু'জনেই শ্রোতা।

ঝুমকো জবায় হাত ভর্ত্তি হয়ে যায়, ছোট্ট ছোট্ট মসৃণ নুড়ি পাথরে পকেট ভারী হয়ে ওঠে।—বাবা হঠাৎ এসে পড়লে চট্ করে

কি উপহার তার হাতে তুলে দেওয়া যাবে ভেবে ঠিক করতে পারে না বলেই বাদলের এই সংগ্রহ। হাতে সময় বেশী থাকলে দু'জনে একটু জুৎ করে পাথর কুচির স্তূপের উপর বসে—হয়তো বাদল অভিযোগের ভঙ্গিতে বলে—'পালা'গুলো সব পুড়িয়ে ফেললে জ্যাঠাবাবু, বাবা এলে কি বলবে?

—বাবা এলে? আমার নদের গোরা নদেয় ফিরলে? মাষ্টার-মশাই বিচলিত কণ্ঠের উপর চেষ্টাকৃত জোর এনে বলেন—বলবো—বেশ করেছি—সব পুড়িয়ে ফেলেছি, তুই হতভাগা মুখ্যু গাধা চলে গেলি কেন?

—বাবাকে তুমি বকবে জ্যাঠাবাবু?

—বকবো না? একশোবার বকবো হাজারবার বকবো। হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আমাকে এই কষ্টটা দিচ্ছে, আর আমি তাকে বকবো না?

বাদল একটু চুপ করে থেকে ম্রিয়মাণভাবে বলে—আমারও তো বাবার জন্যে কষ্ট হয় জ্যাঠাবাবু!

—বকবি, তুইও বকবি—

পিতলের বোতাম আঁটা মোটা কাপড়ের কোটের হাতাটা বারবার চোখের কাছে ওঠে—আচ্ছা করে বকে দিবি।

—ককখনো না।—বাদল সতেজ উত্তর দেয়—একটুও বকবো না আমি বাবাকে, শুধু ভালবাসবো।

—ঠিক বলেছিস বাবা, ঠিক বলেছিস—'শুধু ভালবাসবি'! তুই যে শিশু, তুই যে দেবতা মাণিক, তুইতো আমাদের মতো স্বার্থপর নস্!—'শুধু ভালোবাসবি' 'শুধু ভালোবাসবি', ঠিক বলেছিস!

মনের আবেগে দাঁড়িয়ে ওঠেন মাষ্টারমশাই। উঠে পড়ে পায়চারি করতে থাকেন। একটু পরেই হয়তো বাদল অন্য কথার অবতারণা করে—আচ্ছা জ্যাঠাবাবু, তুমি যে বলেছিলে খবরের কাগজে বাবার নামে চিঠি ছাপিয়ে দিয়েছো, কতোদিন হয়ে গেলো—কই তার উত্তুর এলো না তো?

মাষ্টারমশাই ভগ্নস্বরে বলেন--আসবে রে বাদল আসবে। সেই উত্তুরের আশাতেই তো এমনি করে দিন গুনছি বাবা!

—যে কাগজটায় চিঠি ছেপেছিলে জ্যাঠাবাবু, মামীমা সেটা রোজ পড়ে।

—অ্যাঁ রোজ পড়ে, মামীমা রোজ পড়ে? আর তোর মা?

—মা? মা বুঝি পড়তে জানে?—হঠাৎ হেসে ওঠে বাদল—মা এমন বোকা জ্যাঠাবাবু, তুমি যে সেই ছবিটা দিয়েছিলে তার নীচেয় তো পষ্ট করে লেখা রয়েছে 'ভীষ্মের শরশয্যা'···মা বলে কি, অমন মাটিতে কাঁটা পুঁতে পুঁতে তার ওপর শুয়েছে কেন রে বুড়োটা? গাজনের সন্নিসী বুঝি?

মাষ্টারবাবুর একঝুড়ি কাঁচা-পাকা গোঁফের অন্তরালেও নিষ্প্রভ একটু হাসি উঁকি মারে।

দূরে সিটি বেজে ওঠে।

দু'জনেই সচকিত হয়ে এগিয়ে যায়। মাষ্টারবাবুর নিজস্ব কিছু ডিউটি আছে, বলেন—বাদল একটু দাঁড়া, আসছি। খুব নজর রাখবি, কড়া নজর! কেউ যেন নেমে এদিক ওদিক পালিয়ে যায় না।

যে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি ঘুরে এসে আবার বাস্থুলপুর স্টেশনে নামবে, সে ফের কেন পালিয়ে যাবে এ বিচার নেই মাষ্টারমশাইয়ের কাছে। তাঁর খালি দুর্ভাবনা পলাতক খেয়ালীটা হাতে ধরা দিয়ে আবার যদি পালায়!

ট্রেন 'ইন' করলে খাতায় সই করতে হবে স্টেশনমাষ্টারকে, আবার অর্ডার দিতে হবে 'পাশ' করবার। ও একটা নিয়মমাত্র। বাস্থুলপুর স্টেশনের স্টেশন মাষ্টারের পরিশ্রম, তাঁর পারিশ্রমিকের সঙ্গে ভারসাম্য রেখেই চলে।

ট্রেণ আসে, আধ মিনিট থামে, আবার সিটি দিয়ে চলে যায়।

পড়ে থাকে একটা বিরাট রিক্ততা।

—বাবা আর আসবে না জ্যাঠাবাবু!

হতাশ শিশুচিত্ত থেকে একটা গুমরোনো নিঃশ্বাসের মতোই উচ্চারিত হয় কথাটা—বাবা আর কোনোদিনও আসবে না।

শিউরে ওঠে শ্রোতার প্রাণ! সভয়ে শিশুর মুখে একটা হাত চাপা দেন মাষ্টারমশাই। এ বুঝি বা আপন হৃদয়ের আশঙ্কাকেই চাপা দেওয়া!

—খবরদার ওকথা মুখে আনিসনি বাদল! খবরদার না! আসবে বৈকি, নিশ্চয় আসবে, না এসে যাবে কোথায়?

আর কথা হয় না। বোবা দুটি প্রাণী ফিরতে থাকে গ্রামের দিকে। বাদলকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আবার স্টেশনে ফিরবেন মাষ্টারবাবু দীর্ঘ পথ ভেঙে!

আসার সময় তবু একটা শিশুর সঙ্গ থাকে—থাকে তা'র পৃথিবীতে নতুন আসা কোমল হাতের স্পর্শ, থাকে অপরাহ্নের সোনালী আলো—ফেরার সময় সবটাই অন্ধকার।

তবু আবার ঘণ্টা কতক পরেই অন্ধকারের মাঝখানে একটা আলো উঁচু করে ধরে বারে বারে একই জায়গায় খুঁজে খুঁজে বেড়াবেন মাষ্টার, যদি তাঁর চোখ এড়িয়ে কেউ ট্রেনের কামরা থেকে নেমে পড়ে থাকে!

—জামাইয়ের কোনো খবর পেলে না শশধরের মা?—পুকুর-ঘাটের মজলিশে এ প্রশ্নবাণ নিভাননীর নিত্য বরাদ্দ।

হাতের ঘড়াটাকে অযথা জোর দিয়ে মাজতে মাজতে নিভাননী বলেন—কই আর?

—তা' তোমরা বাপু তেমন জোর তলবে খুঁজছোও না ভাই! যতোই হো'ক মেয়েটার পানে তো চাইতে হবে! নাতিও তো

তোমার খুব 'বাপন্তাওটা' ছিলো, বাপ নিরুদ্দিশ হওয়া অবধি ছেলেটা যেন কালীবর্ণ হয়ে গেছে। একটু চেষ্টা চরিত্তির তোমাদের করা উচিত।

নিভাননী ঘড়াটাকে ছুম্ করে ঘাটের একধারে বসিয়ে বেজার মুখে বলেন—পাড়ায় যখন তা'র হিতুষীর অভাব নেই, চেষ্টা চরিত্তির করলেই পারে। আমার যা ক্ষ্যামতা তা'র বেশী আর কোথ্থেকে হবে ?···অপরা ততোক্ষণে আর এক প্রশ্ন নিক্ষেপ করেন।

—হ্যাঁ গা, শ্যালা ভগ্নিপতিতে ঝগড়াটা হলো কেন, তার আর ফয়সালা হলো না ?

প্রতিবেশিনীদের কৌতূহল আর শীতলত্ব প্রাপ্ত হয় না, ছ'মাসের ঝড় বৃষ্টি রোদ বাতাসের ঝাপটেও ম্লান হয়ে যায় না, একটির পর একটি দিন-রাত্রির প্রলেপ পড়ে পড়েও ঢাকা পড়ে না।

ঘোষাল বাড়ীর রক্তপাতের ইতিহাস আর নিরুদ্দেশের ইতিহাস স্পষ্ট করে জানবার জন্যে আগ্রহের আর শেষ হলো না তা'দের। হবেই বা কেন, গৌরাঙ্গ না ফেরা পর্য্যন্ত ওদের কৌতূহল ঠাণ্ডা হয়ে যাবার অবসর পাচ্ছে না যে !

মনের দুঃখে পাড়া বেড়ানো ছেড়েছে সুধা, যখন তখন 'ঠাকুর দোরে' গিয়ে বসা ছেড়েছেন নিভাননী।

নিভাননী চলে যান। পুকুরঘাট মুখর হয়ে ওঠে তাঁর বাড়ীর আলোচনায়। অনেক দিনের নিস্তরঙ্গ জলে পড়েছে একটি ঢিল, তা'র তরঙ্গকে সহজে থেমে যেতে দিতে রাজী নয় কেউ।

ওদেরই বা দোষ কি ?

এখানে যে কখনো কোথাও কোন ঘটনাই ঘটে না। জন্ম মৃত্যু বিয়ে—সে একেবারে অতি পরিচিত ঘরোয়া ঘটনা। এর মাঝখানে একমাত্র উৎসাহোদ্দীপক ব্যাপার কারো সংসারের কোনো 'কেলেঙ্কারীর' আভাস। সে কথা আগুনের শিখার মতো এক রসনা

থেকে আর এক রসনায় সঞ্চারিত হয়, আবার সে আগুনে নীরস রসনা সরস হয়ে ওঠে, সে প্রসঙ্গে স্তিমিত চিত্ত উল্লসিত হয়ে ওঠে।

আর নিভাননীকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করার মধ্যেও কি কম আনন্দ? একজনকে কিছু অপদস্থ করতে পারলাম, এর চাইতে সুখ আর কি আছে?

বাড়ী ফিরে বাদল দাওয়ায় মাদুর পেতে সামনে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা নিয়ে পড়তে বসে। পড়ায় তা'র অসম্ভব ঝোঁক, যতোই মন খারাপ থাক, পড়ায় অবহেলা হয় না। শুধু মাঝে মাঝে চোখটা কেমন জলে ভরে আসে, বইয়ের পাতা ঝাপসা হয়ে যায়, তখন চোখ তুলে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে সামনের গাছপালার অরণ্যে— অন্ধকার উঠোনটার দিকে।

এক এক সময় বইটা মুড়ে রেখে সরে আসে অন্ধকারের আরো কাছাকাছি, বসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে—কি যে ভাবে ছেলেটা কে জানে! হয়তো বাপের কথা, হয়তো তাও নয়।

এতোদিন বাবা ছিলো, কতো কথা কয়েছে বাদল বাপের সঙ্গে, কিন্তু আশ্চর্য্য, আলাদা করে একটা কথাও মনে পড়ে না কেন! কথা মনে পড়লেই সোনাডাঙা থেকে আসার পথে গরুর গাড়ীতে বসে বাপের সেই পরিহাসদীপ্ত মুখ আর বাদলকে রাগানোর কথাগুলোই মনে পড়ে শুধু।···

'বাদলের এখন ইচ্ছে করছে নতুন মাসীর কাছে থাকবে, পেট ভরে রসোগোল্লা খাবে, জরিপাড় ধুতি নেবে, সিল্কের পাঞ্জাবী নেবে, না রে বাদল?'

নতুন মাসী নাকি একবার লোক পাঠিয়েছিলো বাদলকে নিয়ে যেতে, বাদল দেখেনি, পাঠশালা থেকে এসে শুনেছিলো। দিদিমা সে লোককে তখন ভাগিয়ে দিয়েছে।

কে জানে নতুন মাসীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে বাবাকে খুঁজে পাওয়ার কোন উপায় হতো কিনা। ওরা নাকি অনেক বড়লোক। বড়লোক মানেই তো যাদের অনেক অনেক টাকা থাকে, আর টাকা থাকা মানেই যে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই আয়ত্তে থাকা, এ কথা এই সংসারজ্ঞানহীন শিশুটাও বোঝে।

বাসন্তী পিছন থেকে নিঃশব্দে এসে মাথাটা নাড়া দিয়ে বলে—আয় বাদল, খাবি আয়!

আকস্মিক স্পর্শে বাদল একবার চমকে ওঠে, তারপর স্থিরভাবে বলে—এখন খাবো না, পরে খাবো।

—ওমা, আর কতো পরে খাবি রে—বাচ্চা মানুষটি? ছোট্ট ছেলে বেশী রাত্তির করে খেলে পেটের মধ্যে পাখী ডাকে জানিস তো?

—ওসব তোমার বানানো কথা—বাদল গোঁ ভরে বলে।

—বেশ বানানো কথা তো বানানো কথা। সত্যি যেদিন ডাকবে বুঝবি সেদিন মজা।

—খেলে গল্প বলবে? নতুন গল্প!

—ওরে বাবা, নতুন গল্প আর কোথায় পাবো বল্, আমার সব গল্পই যে পুরনো হয়ে গেছে।

বাসন্তী মৃদু হাসে আর বলে।

—স—ব গল্প পুরনো হয়ে গেছে? সম—স্ত?

—সমস্ত!

—বাবা অনেক নতুন গল্প শিখে আসবে, না মামী? এত্তো—দিন ধরে কতো নতুন নতুন বাড়ীতে বেড়াচ্ছে, কতো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হচ্ছে, না মামী?

—হচ্ছে বৈ কি বাবা!

—জ্যাঠাবাবু বলে—বাবা এলে খুব বকবে!

—সে কথা তো আমিও বলি রে! আচ্ছা করে বকবো।

বাদল চুপ হয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে খেতে থাকে। সকলেই বলে, বাবা এলে বকবে! আশ্চর্য্য! ওদের মনের বাতাস বাদল ধরতে পারে না। অনেক দিনের অনেক প্রতীক্ষার শেষে যে এলো, যার পায়ে পড়ে ধূলো মাখতে ইচ্ছে করবে, তাকে লোকে বকবে কেমন করে?

বড়োদের অনেক কিছুই বড়ো অদ্ভুত!

বাস্থলপুর থানার সামনে একটা লোক এসে মহা ঝামেলা বাধিয়েছে, বলে 'দারোগার সঙ্গে দেখা করবো'।

লোকটার খালি পা রুক্ষ মাথা, গায়ে একটা ছেঁড়া ছিটের সার্ট, পরণের কাপড়ও তথৈবচ। দরজার পাহারাদার পুলিশ তাড়া দিয়ে তাড়াতে পারছে না তাকে। লোকটার নাকি দারোগাকে চাইই চাই।

থানা মানে বিরাট একটা তিন মহলা প্রাসাদ নয়, একতলা একটু ছাউনী। ইনচার্জ গোবর্দ্ধন গড়াই তারই অন্তরালে নিবিষ্টচিত্তে এক-খানি ডিটেকটিভ উপন্যাস গলাধঃকরণ করছিলেন, চেঁচামেচি শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে হাঁক পাড়েন—কে ওখানে!

চাপরাশী তু'কড়ি দাস অকুস্থল দেখে এসেছে, সে অগ্রাহ্যভরে বলে—ও কিছু না, একটা পাগলা ঝামেলা করছে হুজুর।

—ত্থ'ঘা দিয়ে দিতে বলগে যা।

—আজ্ঞে ইয়ে, তেমন পাগল নয় হুজুর, ভদ্রলোকের ছেলে মনে হচ্ছে।

—'পাগল' অথচ 'তেমন পাগল নয়' এটা কি ধরনের কথা হলো হে তু'কড়ি?

—ওই তো কথা হুজুর—তু'কড়ি মাথা চুলকোতে থাকে।

—লোকটা বলে কি?

—আজ্ঞে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

গোবর্দ্ধন বোধকরি অনেকক্ষণ ধরে হুলদেটে কাগজে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা ডিটেকটিভ বইটা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই এই নতুন আলোচনায় চাঙ্গা হয়ে বসেন।

—আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? বটে নাকি! ব্যাটার আস্বা তো কম নয়! শুনগে দিকি কি বলতে চায়।

দু'কড়ি ঘুরে এসে বলে—আজ্ঞে বলছে আপনার কাছে একটা আর্জি আছে, দয়া করে যদি তাকে হুজুরে হাজির হতে আদেশ দেন।

—আচ্ছা, বেটাকে নিয়ে আয় দেখি।

ধরে আনতে বললে বেঁধে আনা যাদের রীতি, 'নিয়ে আয়' বললেই যে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসবে এটা বিচিত্র নয়। পাগলা লোকটা যতোই হাত জোড় করে বলে—'ঠেলছো কেন ভাই, নিজেই তো যাচ্ছি আমি'—দু'কড়ি ততোই ধাক্কা মারে।

গোবর্দ্ধন গড়াই টেবিলের উপর পা তুলে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, লোকটাকে দেখে মুখের বিড়িটা হাতে নিয়ে গুরুগম্ভীর চালে বলেন—গোলমাল করছিলে কেন?

—আজ্ঞে আমি তো গোলমাল করিনি, গোলমাল আপনার চৌকিদারেরাই করছিলো!

—বটে!

—হ্যাঁ দারোগা সাহেব, এক কথায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিলেই মিটে যেতো।

—হুঁ! আমার সঙ্গে দেখা করার দরকারটা কি হে? চাও কি?

লোকটা একটু ঢোক গিলে নিয়ে বলে ওঠে—আজ্ঞে ফাঁসি হতে চাই!

দু'কড়ি মনিবের সম্মান রক্ষার্থে উচ্চহাসির বদলে মুখ ফিরিয়ে খুক্‌খুক্ করে হাসে। আর মনিব গোবর্দ্ধন গড়াই হা হা করে হেসে ওঠেন।

লোকটা অবাক হয়ে বোধকরি দারোগার বিরাট ভুঁড়ির কাঁপুনি

দেখতে থাকে। খানিক পরে কাঁপুনি থামে। দারোগা বলেন—এ ব্যামো কতোদিন হয়েছে হে?

—আজ্ঞে কি বলছেন?

—বলছি—মাথার ব্যামোটি কতোদিন স্ফজন হয়েছে?

—বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, মাথার ব্যামো নয়। মাথার যন্ত্রণা বলতে পারেন বরং। আমি খুন করেছি হুজুর, ফাঁসিতে ঝুলতে চাই।

দারোগা ওকে বদ্ধ পাগল ভেবেই একটু মুচকি হেসে বলেন—তোমার প্রার্থনাটি মন্দ নয় হে। বেশ ইণ্টারেষ্টিং লাগছে। ওরে তু'কড়ি, যা এনাকে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিগে যা, বামুনের ছেলের বাসনা মিটে যাক।

—আহা আপনি দয়া করে আমার কথাটাই শুনুন না। খুন আমি করেছি সেই চণ্ডীর মেলার সময় বুঝলেন, তখন ঝোঁকের মাথায় ছুট মেরে গেলাম পালিয়ে, কিন্তু আর পারছি না হুজুর! পালিয়ে পালিয়ে জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। চোখ বুজলেই রক্ত দেখি, ফাঁসি ছাড়া আমার নিস্তার নেই।

গোবর্দ্ধন গড়াই বোধ করি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলেন—হুঁ, খুনটা করেছিলে কোথায়?

—আজ্ঞে এই বাস্তুলপুরেই—

—বাস্তুলপুরে! ফোঃ! আমার এলাকায় খুন হলো, আর আমি টের পেলাম না? যাও যাও, ঝামেলা কোরো না।

নিজের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেন গোবর্দ্ধন গড়াই।

ভেবেছিলেন পাগল নাচিয়ে খানিকটা সময় কাটবে, তেমন জুৎ হলো না। লোকটা ঠিক পূরো পাগলের মতোও নয়।

—আপনি দয়া না করলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে দারোগাবাবু! শীগগির আমায় ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করুন।

—আঃ, এ তো বড়ো ঝামেলা করলো! নাম কি তোমার?

—নাম! আমার নাম! ওঃ, নাম গৌরাঙ্গ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

যেন বিস্মৃতির গহ্বর থেকে নামটা তুলে আনে গৌরাঙ্গ।

—বটে! বেড়ে বাহারি নামটা তো! হঠাৎ খুন করার সখ হলো কেন বলো তো হে?

লোকটা নিঃশব্দে একবার কপালে হাত ঠেকালো।

আর পিছন হতে দু'কড়ি তার ক্যারিকেচার করলো।

গোবর্দ্ধন গড়াই জ্বলন্ত বিড়িটায় একটা সুখটান দিয়ে বলে ওঠেন—খুন! হুঁঃ! আমার থানায় খুন হলো, আর আমি টের পেলাম না! গোবর্দ্ধন গড়াই ঘুমন্ত বেড়াল নয় হে, জ্যান্ত বাঘ! এ থানার প্রত্যেকটি খবর গড়াইয়ের নখদর্পণে বুঝলে?

—আজ্ঞে খুব সম্ভব সংবাদ গোপন করেছে। এ গাঁয়ের শশধর ঘোষালকে খুন করে ফেরার হয়েছিলাম আমি।

গোবর্দ্ধন এবার সোজা হয়ে বসেন, চোখে মুখে একটা ব্যঙ্গের ইসারা করে বলেন—কি হয়েছে? কি নাম বললে? শশধর ঘোষাল!

হঠাৎ স্থিরতার বাঁধ ভেঙে যায় লোকটার, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বলে—তিনি আমার বড়ো ভাইয়ের মত ছিলেন দারোগা বাবু, আমাকে খাইয়েছেন পরিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, আর আমি তাঁকে—এ ঘৃণিত জীবন বয়ে বেড়াবার ইচ্ছে আর নেই দারোগা বাবু!

গোবর্দ্ধন গড়াইয়ের বোধ করি একটু করুণা হয়, তাই ব্যঙ্গভাব ছেড়ে বলেন—দেখো হে বাপু, আমি তোমায় ভালো পরামর্শ দিই শোন, একটা কবরেজের কাছে যাও। একটু অষুধপত্তর করোগে। কোনো কারণে মাথাটা তোমার গরম হয়ে গেছে।

—হায় ভগবান! আমি কি করে বিশ্বাস করাই এঁকে!—গৌরাঙ্গ সহসা ব্যগ্রভাবে বলে—আমার সাক্ষী আছে হুজুর! চলুন তার কাছে!

—ও, সাক্ষীটাক্ষী রেখে গুছিয়ে খুন করেছিলে বলো! দু'কড়ি তোমাদের ডাব মজুত নেই?

—আজ্ঞে বিলক্ষণ! এখুনি আনছি, কচি না 'নেওয়া' হুজুর?

—না না, আমায় নয়, আমায় নয়, এঁকে দিতে বলছিলাম—অর্থাৎ এও এক প্রকার উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গ !

গৌরাঙ্গ এবার বিরক্ত হয়েছে। ও ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে—ডাব খাইয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে না, আমি পাগল নই ! জানি জানি··· দারোগাদের বাহাদুরী জানতে কারো বাকী নেই ! নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোলেই হলো, দশটা খুন হয়ে গেলেই বা হিসেব রাখছে কে !

—চোপরাও ! খবরদার !

জ্যান্ত বাঘ গর্জ্জন করে ওঠে।

—ওঃ খবরদার ! ভয়টা কিসের মশাই, ভয়টা কিসের ? ফাঁসির বাড়া তো শাস্তি নেই, যে লোক সেইটাই চায়, তাকে আবার ভয় খাওয়াবেন কিসে ? চলুন না ইষ্টিশনমাষ্টার মশাইয়ের কাছে, ভজিয়ে দিচ্ছি—খুন করেছি কি না। মাষ্টারমশাই সাক্ষী আছেন।

দু'কড়ি এক পায়ে খাড়া, চটপটে স্বরে বলে—আনবো হুজুর তলব দিয়ে ?

—কাকে ?

—ইষ্টিশান মাষ্টারকে ?

—ডিউটিতে আছে না ?

—ডিউটি !···দু'কড়ি তাচ্ছিল্যভরে বলে—বুড়োর কাজের মধ্যে তো ঝিমুনি ! মাঝে মাঝে একটা ছোটো ছেলের হাত ধরে বেড়াতে যেতে দেখি।

দু'কড়ির বাড়ী স্টেশনের ধারে।

ছোট ছেলে !

গৌরাঙ্গর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে···নিশ্চয় বাদল ! হা ঈশ্বর ! কী ভুল করলো সে, একবার ওদের দেখে এলো না কেন দূর থেকে চুপি চুপি ? মাষ্টারদাকে বলে এলো না কেন—মাষ্টারদা, তোমার অনুরোধ রাখা হলো না, আমায় ক্ষমা করো !

এমন করে বেঁচে থাকা অসম্ভব ! এ বাঁচার মূল্য কানাকড়িও

নয়। কিন্তু কি বোকামীই করেছে সে, একবার কেন ওদের দেখে এলো না। কে জানে কোথা দিয়েই বা এসেছে, সোজাসুজি ট্রেনের পথে তো নয়। এসেছে কোন গ্রামান্তর থেকে হাঁটতে হাঁটতে, মাঠ জঙ্গল পার হয়ে খানাখন্দ ডিঙিয়ে। পথ চলতি যাকে পেয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করতে করতে এসেছে—বাস্মুলপুর ফাঁড়িটা কোন্ দিকে বলতে পারো ভাই, বাস্মুলপুর ফাঁড়ি?

গোবর্দ্ধন গড়াই ভাবেন···ভালো বিপদে ফেললো তো! কে জানে সত্যিই কোন চুলোয় কিছু করে এসেছে কি না, মাথাটা তা'তেই বিগড়ে গেছে। দু'কড়ি বেটা যে আবার সাক্ষী রয়েছে, এ কেসকে একেবারে অবহেলা করলে টুক্ করে ওপরওলাদের কানে তুলবে। ব্যাটা ঘুঘু, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার বদভ্যাস ওর বরাবরের।

তারপর যদি কোথাও কোনো ঘটনা আবিষ্কার হয়ে পড়ে! তখন? নিদেন পক্ষে পাগলের উপরও তো একটা দায়িত্ব আছে, সরকারী কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর?

অগত্যাই গোবর্দ্ধন গড়াই এক চোখ মুদে হুকুম দেন—যা ধরে নিয়ে আয় ইষ্টিশান মাষ্টারকে।

—আজ্ঞে কি বলে ডাক দেবো হুজুর।

—বলবি সাক্ষী হতে হবে, দারোগা বাবুর হুকুম!

ভালোমানুষ স্টেশনমাষ্টার মশাই বিব্রত ভাবে বলেন—ইষ্টিশান ছেড়ে যাবার হুকুম তো নেই ভাই, এখন ডিউটিতে রয়েছি।

দু' কড়ি পা ঠুকে বলে—দারোগাবাবুর হুকুম! যেতেই হবে মাষ্টারমশাই!

—বেশ!

মাষ্টারমশাই নিজস্ব ছাতাটি নিয়ে গুটিগুটি এগোতে থাকেন।

—পা চালিয়ে আসেন না মশাই—দু'কড়ি হাঁকে।

—যাচ্ছি ভাই যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলোতো হে দু'কড়ি? সাক্ষী কিসের, বুঝতে তো পারছি না?

—বুঝতে আর হবে না মাষ্টারমশাই—দু'কড়ি বলে—এক পাগলের পাল্লায় পড়ে দারোগাবাবু এখন বুঝলেন কি না নাজেহাল! ব্যাটা এসে বলে কি না—'আমি খুন করেছি আমায় ফাঁসি দাও'।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন মাষ্টারমশাই, বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে বললেন—এই কথা বলেছে?—কি রকম লোক?

—পাগলা পাগলা লোক আর কি, পা চালান মাষ্টারমশাই, আমাদের দারোগা বাবুটি তো আবার তেমনি কি না, দু'ঘা লাগিয়ে দিয়ে ভাগিয়ে দে, তা' নয়—তা'র আদ্যোপান্ত বিবরণ শোনো বসে বসে। তিনি খুন করেছেন—ইষ্টিশান মাষ্টারমশাই সাক্ষী আছেন—এই সব বিত্তান্ত।···আবার খুন করেছেন কা'কে, না শশধর ঘোষালকে, যে লোক দু'বেলা কাছারি ঘর করছে···ওকি অমন করছেন কেন আজ্ঞে?

—অমন করছি কেন! অমন করছি কেন! না না কিছু করিনি তো ভাই, কিছু করিনি তো! চলো চলো কোথায় যেতে হবে নিয়ে চলো ভাই দু'কড়ি!

মধ্যরাত্রির অন্ধকারে রক্তাক্ত শশধর আর তার ক্রন্দনাকুল মাতা ভগিনীর মুখের উপর যবনিকা টেনে দিয়ে যে ঘরখানা থেকে বিদায় নেওয়া হয়েছিলো, আবার সে ঘরের যবনিকা উঠতে দেখা গেলো বৈশাখের এক উজ্জ্বল অপরাহ্নে।

বাগানের দিকের সেই অভিশপ্ত দরজাটা রয়েছে খোলা, খোলা দরজা দিয়ে বৈশাখী বিকেলের এলোমেলো হাওয়া ঘরের সব জিনিষকে যেন চঞ্চল করে তুলছে।

দরজার কাছটায় চুপ করে বসেছিলো শশধর, একটা বাতাস-কম্পিত ঝিরঝিরে নিমগাছের দিকে তাকিয়ে।

দীর্ঘ দুটি মাস বিছানায় পড়েছিলো শশধর, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে তার এই ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে—বাসন্তী যখন অন্যত্র থেকেছে, থেকেছে রান্নাঘরে, পুকুর ঘাটে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে শশধর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছে একটুকরো আকাশ, আর এই গাছটাকে।

তখন কিন্তু গাছটার না ছিলো এমন ঐশ্বর্য্য, না ছিলো এতো রূপ! পাতাগুলো গিয়েছিলো নিশ্চিহ্ন হয়ে, আর সেই পাতাঝরা ন্যাড়া ডালগুলো যেন আকাশের দিকে বাহু মেলে অহরহ কার কাছে কি ভিক্ষা জানাতো।

কি সেই ভিক্ষা?

সে কি এই প্রাণরস? যে রস সমস্ত রিক্ততাকে পূর্ণ করে তোলে, নিমের তিক্ততাকেও দেয় লোভনীয় আস্বাদন! ওই যে ওর সিল্কের মতো হাল্‌কা ঝিরঝিরে পাতাগুলির অবিরাম নৃত্য, ওই যে পীত হরিতের উজ্জ্বল সমারোহ, এ সব কোথায় ছিলো? কে জোগায় এই প্রাণরস? মৃত বিবর্ণ ডালগুলোয় কে আনে নতুন জীবনের স্পন্দন?

ঘরে বাইরে সবাই বলে শশধর যে অবস্থা থেকে বেঁচে ফিরেছে, সে ওর 'পুনর্জন্ম'। চোটটা তো কম লাগেনি। ধারালো অস্ত্রটা হাত থেকে খসে মাটিতে না পড়ে, পড়েছিলো ওর নিজের কাঁধে।

কতোদিন যে ওকে জ্ঞান চৈতন্যের বাইরে থাকতে হয়েছিলো, তা ঠিক মনে নেই, কিন্তু এইটা মনে আছে প্রথম যখন জ্ঞান হলো, তখন মনটা 'ছি ছি' করে উঠেছিলো নিজেরই উপর।

আশ্চর্য্য! ঘৃণা আসেনি বাসন্তীর প্রতি, হিংস্র ক্রোধ আসেনি হতভাগা পলাতকটার প্রতি। লজ্জায় অনুশোচনায় মনটা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, আর সেই স্তব্ধতার অন্তরালে একটানা একটা ধ্বনি অনুচ্চারিত উচ্চারণে বলে চলেছিলো 'ছি ছি!'

পুনর্জন্ম, না নবজন্ম!

নইলে শশধরের এতো চিন্তাশক্তি হলো কি করে? এমন গভীর হয়ে গেলো কেমন করে সে? বিছানায় পড়ে পড়ে শুধু ভেবে ভেবে? না কি জানলার মধ্যে দিয়ে অবিরাম যে একখানি প্রসন্ন দৃষ্টি ওর মুখের পানে চেয়ে থাকতো, সেই এক টুকরো আকাশ, সে কি ওর মনের দরজায় পৌঁছে দিয়ে গেছে উদারতার বার্ত্তা?

বিছানায় পড়ে শশধর নতুন করে দেখেছে বাসন্তীকে, বুঝি বা নতুন করে পেয়েছে।

চোখ খুললেই চোখে পড়েছে একখানি বেদনাহত উদ্বিগ্ন মুখ, দেখেছে সে মুখের অধিকারিণীর নিরলস সেবা। সে মুখ যেন দেবীর মুখ, সে সেবা যেন তার হৃদয়ের অর্ঘ্য।

না, আর ভুল করবে না শশধর।

শশধর আর বাসন্তী—এরা আর ওরা—এই সব অল্প শিক্ষিত আর অশিক্ষিত অগণিত নরনারীর দল, এদের জীবনে অসংখ্য ঘাটতি, এদের বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, মার্জ্জিত ভাষায় মনের কথা ব্যক্ত করবার শিক্ষা নেই, সুচারুভাবে আপন হৃদয়রহস্যকে বিশ্লেষণ করে দেখবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু বিধাতার দেওয়া একটি সম্পদ থেকে ওরা বঞ্চিত নয়। অনুভূতির ঐশ্বর্য্যে দীন নয় ওরা।

সেই অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে হয়তো পারে না, হয়তো প্রকাশ ভঙ্গীটা দুর্ব্বল, আর শিক্ষিত সমাজের কাছে হাস্যকর, তবু ওদের জীবনে তার মূল্য কম নয়। ওরা যখন ভাবে, তখন নিজের ধরনেই ভাবে সত্যি, কিন্তু তার আলোড়নটা তো কম হয় না। যখন ডুবে যায় গভীরে, যখন মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তখন ওদেরও ভালো লাগে বৈশাখের অপরাহ্ণ বেলায় পীতে হরিতে মেশানো নতুন পাতাধরা নিম গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে, উদাস

হয়ে যেতে ভালো লাগে সেই সিঁদুর মতো চিকণ পাতাগুলির অবিরাম ঝিরঝিরানি দেখতে।

আজ বুঝি বৈশাখী পূর্ণিমা।

ঠাকুরবাড়ীতে আজ সত্যনারায়ণ আছে। অনেক দিনের পর আজ ঠাকুরবাড়ী গেছেন নিভাননী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। বোধকরি তার স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তন কামনা মানত করাতে।

'কলাবতীর' উপাখ্যানের সঙ্গে যদি সুধার ভাগ্যের কিছু মিল হয়! জামাইকে নিভাননী দেখতে পারতেন না সত্যি, কিন্তু তার দ্বারা যে একটা কুৎসিত কাজ সম্ভব নয়, এ জ্ঞান নিভাননীর ছিলো।

পরস্ত্রীকে ঘরের বার করে নিয়ে যাবার পরিকল্পনাটা যে তার বাদলের পরিকল্পনার চাইতে কিছু ঘোরালো নয়, এও তিনি বুঝেছিলেন। শশধরের একটা ফাঁড়া ছিলো এই ধরেছেন নিভাননী।

কিন্তু এখন ভাবনা, সে হতভাগা ছোঁড়া পালিয়ে গিয়ে আত্মঘাতী হলো কি না। নিজের মেয়ের সে সর্ব্বনাশের চিন্তায় নিভাননী নিতান্তই মুসড়ে গেছেন। তাই সুধাকে উপবাস করিয়ে তাকে নিয়ে গেছেন দেবদুয়ারে মানত করাতে।

বাদলটাকে তো একবার সঙ্গে নেবার জো নেই, বিকেল হলেই ইষ্টিশান যাওয়া চাই তার। বাড়ীতে কোনো কথা ব্যক্ত করে না বাদল, তবু বাড়ীশুদ্ধ সকলেই বোঝে, কিসের দুরাশায় অবোধ ছেলেটা প্রত্যহ একই জায়গায় ছোটে, আর কোন্ হতাশায় ম্লান মুখে ফিরে এসে কোনো কথা না বলে বই নিয়ে পড়তে বসে।

বাদলের দুঃখ দেখে মাঝে মাঝে কঠোরহৃদয়া নিভাননীরও বুক ফাটে।

ব্যস্ত হাতে অবশ্য-প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্ম সেরে বাসন্তী এসে ঘরে ঢুকলো। একটু চুপ করে শশধরের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করলো—অমন উদাস হয়ে কি ভাবছো গো?

শশধর চমকে তাকালো, বাসন্তীর আসা ও টের পায়নি। তারপর বললো—ভাবছি সেই হতভাগাটার কথা, যে খেয়ালী, হয়তো কোথাও জলেই ঝাঁপ দিয়েছে।

—দুর্গা দুর্গা!—বাসন্তী ম্লানভাবে বলে—ও কথা বোলো না গো!

—সাধে কি বলছি বাসন্তী, আজ এই ছ'মাসে কোনো খবরও তো পাওয়া গেলো না ছোঁড়ার। কলকাতার তিন তিনটে কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিলাম।

বাসন্তী একটুখানি স্তব্ধ হয়ে বলে—সে কি আর ওসব কাগজ-পত্তর পড়ে?

—পড়ে না, তাতো জানি, কিন্তু ও ছাড়া খোঁজবার আর তো কোনো উপায়ও জানি না। এতো বড়ো পৃথিবীতে কেউ হারিয়ে গেলে কি খুঁজে বার করা যায়, যদি সে নিজে ইচ্ছে করে এসে ধরা না দেয়?

—আমার মন বলে—'নিশ্চয় আসবে'। একদিন না একদিন নিশ্চয় আসবে।

অকপটে আপন হৃদয়বিশ্বাস ব্যক্ত করতে দ্বিধা করে না বাসন্তী। সে জানে শশধরের দ্বিধা আর সংশয় ঘুচেছে।

নাঃ সত্যিই আর দ্বিধা নেই শশধরের।

নিজের মনের সেই কুৎসিত সন্দেহের গ্লানিকর ইতিহাস স্মরণ করলে এখন ওর যেন লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। সেই ভয়াবহ রাত্রে সত্যিই সে জ্ঞান হারিয়েছিলো। গৌরাঙ্গকে রান্নাঘরের দরজায় বসে চুপি চুপি কথা কইতে দেখেই ওর মনের মধ্যেকার গুটিয়ে থাকা সাপটা উঠেছিলো ফণা তুলে, আর পিছন থেকে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে যখন শুনেছিলো বাড়ী থেকে পালানোর পরিকল্পনা, তখন রইলো না কোনো বোধ, হারিয়ে ফেললো হিতাহিত জ্ঞান।

এতো বড় একটা ঘোরালো পরামর্শের কারণটা যে এমন হাস্যকর

একথা কে বুঝতে পারবে? কিন্তু সেই প্রসঙ্গে বাসন্তী একদিন জোর দিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলো—বোঝা উচিত ছিলো। দশ বছর ধরে দেখছো না তুমি ওকে? দেবতা আর জানোয়ারে তফাৎ ধরতে পারো না? বলেছিলো—সংসারের কোনো জ্ঞান ওর আছে দেখেছো কোনো দিন? স্বার্থবুদ্ধি আছে এক ফোঁটা? মানুষকে খামোকা সন্দেহ করলেই হলো? সন্দেহটা কি ছোটো কথা? শুধু ওকেই সন্দেহ করোনি, আমায় সন্দেহ করেছো তুমি, কেননা পরিবার হলো মুঠোর জিনিষ, মারো কাটো কেউ কিছু বলবে না। তাকে সন্দেহ করলে ফাঁসির দায়ে পড়তে হবে না, তাই ফট্ করে অমনি করে বসলে সন্দেহ, বলে বসলে সে কথা। যে অপমানের কথা অপর একটা মেয়েমানুষের নামে বলে ফেললে মানহানির দায়ে ঘানি টানতে হয়, সে কথা অনায়াসে বলে বসো তোমরা পরিবার কেনা বাঁদী বলে, কেমন?

সেই আহত অভিমানে আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে শশধর যেন মরমে মরে গিয়েছিলো, নিজেকে তখন বড়ো ক্ষুদ্র মনে হয়েছিলো তার। বাসন্তী যে আর কাউকে ভালোবাসবে, এ চিন্তাই তার এমন অসহ্য যে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি।

বাসন্তী সতেজে বলেছে—ভালোবাসি তার কি? বাদলাকে ভালোবাসি না আমি? ভালোবাসা মানেই কি খারাপ? বন্ধুত্ব থাকতে পারে না দুটো মানুষে? একটা মানুষের ওপর আর একটা মানুষের ছেদ্দাভক্তি থাকতে পারে না? বিয়ে হয়ে এসে পর্য্যন্ত দেখেছি তোমাদের বাড়ীতে মানুষগুলো যেন কাজ করার যন্তর, হাসি নেই কথা নেই গান নেই, প্রাণ আমার হাঁপিয়ে আসে। ওই একটাই মানুষ দেখলাম যার প্রাণ আছে। তাই তো ওকে আমার ভালো লাগে, তাই বলে তার মানেই আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে যাবার মতলব ভাঁজবো? বুদ্ধি বটে একখানা! একটা মানুষের সঙ্গে হেসে দুটো কথা বললেই যদি মেয়ে মানুষের সতীত্ব চলে যায়, তবে নাই বা

থাকলো অমন ঠুনকো জিনিষ। সে জিনিষের মূল্যই বা কি? আর তোমারই বা কেমন ভালোবাসা যে, একফোঁটা বিশ্বাস রাখতে জানো না? মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাসই পুষে রাখলে তো সে বৌকে ঘরে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখার কোনো মানে আছে? নিজের ওপর অপমান আসে না তা'তে? ঘেন্না করে না সে বৌকে নিয়ে ঘর করতে? দেহটা তো মাটির ঢেলা, মনে মনে যদি কেউ পরপুরুষকে ভজে, তা'র আর রইলো কি?

বাসন্তী যদি লেখাপড়া জানা সভ্য মেয়ে হতো, ওর এই জোলো জোলো কথাগুলো একটা জোরালো বক্তৃতা হয়ে উঠতে পারতো, তা হয়নি। তবু ওর বক্তব্য ও বুঝিয়েছে বৈ কি। ওর চাইতে মার্জ্জিত ভঙ্গীতে প্রকাশ করলে শশধরই কি বুঝতে পারতো?

অহরহ সেবা আর সাহচর্য্যের মধ্যে অনেক অবসর পেয়েছিলো বাসন্তী, বলে নিয়েছিলো অনেক কথা। বলেছিলো—এই যে তুমি কাছারী বাড়ীতে বাবুদের কাজ করো প্রাণ দিয়ে বিশ্বাসী হয়ে, ওরা যদি খামোকা তোমাকে চোর অপবাদ দিয়ে বসে, বলে 'নায়েবমশাই আমাদের ত'বিল তছ্‌রূপ্‌ করেছে,' মনে কেমন লাগে বলো তো? মনের ঘেন্নায় আমি তো আত্মঘাতী হবার সংকল্পই করেছিলাম, শুধু তোমার এই অবস্থার জন্যেই সব ভুলতে হলো।

শশধর ওর হাত ধরে কাতরভাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলো, বলেছিলো—আমি অন্ধ ছিলাম বাসন্তী, কোনো দিন তোমায় বুঝতে পারিনি।

বাসন্তী বলল—তোমাদের ইষ্টিশানমাষ্টারও হয়েছে আচ্ছা এক পাগল, রোজ এই ডনৃডনে রোদ্দুরে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে রেলগাড়ী আসা দেখানো চাই।

—বাদলা ফেরেনি এখনো, না?

—এই এলো, আমি ওকে বলে কয়ে ঠাকুরবাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম, বললাম—সেখানে মা আছে, দিদিমা আছে, যা বাবা যা, ঘুরে

আয়, মায়ের প্রাণটা তবু একটু জুড়োক—তবে যায়। ঠাকুরঝির জন্যে বড় মন কেমন করে আমার। সে জৌলস নেই, সে কোঁদল নেই, সেই পাড়া বেড়ানোয় ঝোঁক নেই। শূন্য প্রাণ খাঁ খাঁ করে, আর বসে বসে একখানা চটের আসনে ফুল তোলে।

—আসনে ফুল তোলে? সুধা ওসব পারে নাকি?

—পারতো না, শিখে নিয়েছে আমার কাছে। বলে—ও যদি কখনো আসে, এতে বসবে, আর না যদি আসে, সুধা মরলে সুধার চিতায় দিও।

বলতে গিয়ে শুধু বাসন্তীরই নয়, শুনতে শশধরেরও দুই চোখ সজল হয়ে আসে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শশধর বলে—বড়ো ভাই হয়ে আমি ওর এয়োতের ওপর খাঁড়া তুলেছিলাম।

—থাক ওসব ভেবে আর মন খারাপ কোরো না। ভগবানের কাছে অষ্টপ্রহর প্রার্থনা করছি—ঠাকুর, ঘরের মানুষটাকে ঘরে ফিরিয়ে দাও, ঠাকুরঝির প্রাণের জ্বালা দূর হোক, ছেলেটার প্রাণ রক্ষে হোক, আর আমি আমার বন্ধু পেয়ে বাঁচি।

শশধর করুণ হেসে বলে—আর আমার ভাগে কিছু রাখলে না যে?

—তোমার? বাসন্তী একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে—তুমি আবার শুম্ভ নিশুম্ভের পালা বাঁধো।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকে···এক সময় সন্ধ্যা হয়ে আসে, বাসন্তী উঠে পড়ে বলে—যাই তুলসীতলায় সন্ধ্যে দিইগে।

শশধর বলে—আমারও আহ্নিকের জোগাড়টা করে দাও। দূর, পুজো পাঠ আর ভালো লাগে না। করলাম তো সেই ন' বছর বয়স থেকে পৈতে হওয়া ইস্তক, কি আর হলো! মনের গলদই যদি ঘোচাতে না পারলো তো, বৃথাই গুরু আর গায়ত্রী!

শশধর যখন পূজোয় বসেছে, সহসা বাইরে থেকে কেমন একটা হৈ চৈ কানে আসে। উঠোনের ওদিকে বেড়ার দরজাটার কাছ থেকেই যেন গোলমালটা আসছে। গায়ত্রী ধরেছে, উঠতে পারে না শশধর, শুধু জপ স্থগিত রেখে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

অনেকগুলো গলার মধ্যে ও কার গলা? কে যেন মিনতি করে করে কাকে কি বলছে, আর তার চারপাশে উদ্দাম হয়ে উঠেছে অনেক-গুলো কণ্ঠের কলগুঞ্জন। কি হলো, এই ভরসন্ধ্যায় কেউ চোরটোর ধরলো না কি? কিন্তু ও কণ্ঠস্বর কার?

যো সো করে পূজো সেরে শশধর যেই পূজোর ঘর থেকে বেরোতে যাবে, ঠিক সেই সময় সহসা সদ্যআগত বাদলের তীক্ষ্ণ গলা বাঁশীর মতো চীৎকার করে ওঠে—বাবা! বাবা! আমার বাবা এসেছে রে!

সঙ্গে সঙ্গে নিভাননীর তীব্র ক্রন্দন—ওরে আমার হারানিধি ফিরে এসেছে রে। বৌমা, শীগগির যাও, ছুটে গিয়ে পাড়ার একজন এয়োর হাতে পান সুপুরি দিয়ে এস। হতভাগার জন্যে পান সুপুরির ব্রত মেনে রেখেছি আমি।

বিরহ বুঝি এমনি করেই চিত্তকে শুদ্ধ করে তোলে!

হয়তো ভবিষ্যতে আবার নিভাননী জামাইকে গাল পাড়বেন, আবার সশব্দে ঘোষণা করবেন, অমন জামাই থাকার চেয়ে মেয়ে বিধবা হওয়াও ভালো, তবু এই ক্ষণটুকু তুচ্ছ নয়, এই ক্ষণটুকুই পরম ক্ষণ। অসতর্ক আকস্মিকতার মুহূর্তে মানুষের যে রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই তো আসল।

ইন্‌স্‌পেক্টর গোবর্দ্ধন গড়াইকেও ধরে এনেছেন মাষ্টারমশাই, ছাড়েননি। পথে জমে যাওয়া পাড়ার লোকরা আপাততঃ দরজা থেকে বিদায় নিয়েছে, কারণ সন্দেহ তাঁদের ঘোচেনি এখনো। ইন্‌স্‌পেক্টরের আবির্ভাবের সঙ্গে একটা কল্পিত কাহিনী যোগ করে

ওরা আপাততঃ গেছে জল্পনা কল্পনা করতে। কে জানে বাবা, যদি কারো সাক্ষ্য চেয়ে বসে!

অবিশ্যি চাইলেই দিয়ে বসবে, বাসুলপুরের লোক এতো বোকা নয়। সে রাত্রে, অর্থাৎ যে রাত্রে না কি ওদের শালা ভগ্নিপতিতে কি নিয়ে বচসা হয়ে একটা রক্তপাত কাণ্ড হয়ে গেলো, সে রাত্রে তখন পাড়াসুদ্ধ লোক যে ঘুমে অচেতন হয়ে ছিলো এ আর কে না জানে!

গড়াইয়ের সঙ্গে শশধরের যথেষ্ঠ পরিচয় ছিলো, কাজেই তিনি বাদলকে এবং দুটি প্রতীক্ষমানা নারীকে অসহিষ্ণুতার শেষ সীমায় এনে তবে বিদায় নিলেন—থালা বোঝাই মিষ্টি উদরসাৎ করে।

বাপের বুকের কাছে বসে থাকা বাদল এতোক্ষণে যেন বাবাকে ফিরে পাওয়ার আশ্বস্তির নিশ্বাসটা ফেলে বাঁচলো।

মাষ্টারমশাই বসেই থাকেন, গৌরাঙ্গর সমস্ত ইতিবৃত্ত না শুনে নড়বেন এ ভরসা কম। উৎকণ্ঠিত দুটি নারীহৃদয়ও যে উৎসুক হয়ে রয়েছে তাকে একান্ত করে পাবার আশায়, সে খেয়াল মাষ্টারমশাইয়ের নেই।

সুধা ভাবে, বাবাঃ বুড়ো দেখছি আজ আর নড়বে না। কাজ কর্ম্ম নেই না কি ওর? এসে যখন পড়েছে, তখন জানবিই তো সব। কালই তো ছুটবে তোর আড্ডায়। বাড়ীর মানুষকে বাড়ীর লোকের সঙ্গে সুস্থ হয়ে দুটো কথা কইতে দে।

স্বামী যখন আসেনি, যখন ভয়ঙ্কর একটা আশঙ্কা ছিলো মনের মধ্যে—হয় তো বা সে নেই, তখন মনে ভেবেছে—যদি ভগবানের দয়া হয়, যদি সে ফিরে আসে, তখন কোনো লজ্জার বাধা মানবে না, ছুটে গিয়ে পায়ে পড়বে, বলবে, আমায় মাপ করো।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখছে কই কিছুই তো পারা যায় না। নবোঢ়াবধূ বিদেশ প্রত্যাগত স্বামীর আশে পাশে যেমন ঘুরতে থাকে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে তেমনি একটা বাড়তি লজ্জাতে ঘোমটাই দিতে হচ্ছে বরং।

হয়তো অপেক্ষা করতে হবে সেই রাত পর্য্যন্তই।

বাসন্তী ভাবছে, এ কি হলো! আকস্মিকতার রোমাঞ্চ যে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে! কিছুই কথা হলো না, হলো না তিরস্কার করা।

তবু মাষ্টারমশাইয়ের ভালোবাসার মর্ম্ম বুঝতে পারে বাসন্তী, বুঝতে পারে তাঁর হৃদয়াবেগের আকুলতা। তাই সেও অবগুণ্ঠনের আড়ালে বসে দেখতে থাকে—আহা কী চেহারাই হয়েছে লোকটার! সেই চাঁপাফুলের মতো রং যেন তামামূর্ত্তি হয়ে গেছে।

এখন আর শশধরের মিথ্যা সন্দেহ প্রবৃত্তিকে দোষ দিতে পারছে না, ভাবছে সব দোষ তার নিজের।

বাসন্তী যদি অমন ছেলেমানুষী না করতো, তা হলে তো এ সবের কিছুই হতো না। ভগবান সব ঠিক করে দিলেন তাই! যদি শশধরের কিছু হতো! যদি গৌরাঙ্গ আত্মহত্যা করে বসতো!

শিউরে উঠে স্তব্ধ হয়ে থাকে বাসন্তী।

এক সময় ভাবতে থাকে···অনেক দিনের অনেক উৎকণ্ঠার শেষ হলো, সুধা তার স্বামীকে পেলো, বাদল পেলো তার বাপকে—শুধু এই ভেবেই কি এমন আনন্দের জোয়ার এলো প্রাণে?

না, নিজের দিকে থেকেও যে রয়েছে অনেকখানি লাভের হিসেব।

তবু নিজেকে সে ধিক্কার দেয় না, আপন হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ দেখে শিউরে ওঠে না, আতঙ্কিত হয় না। বাসন্তীর সাহস আছে।

পুরুষের বন্ধুত্বকে স্বীকার করে নেবার মতো জোরালো সাহস।

নারী পুরুষে বন্ধুত্ব হওয়া কি সত্যই অসম্ভব? এমন মেয়ে কি থাকতে পারে না, যারা মেয়ে-মনের নিতান্ত মেয়েলি গল্পের মধ্যে না পায় মনের খোরাক, না পায় বৈচিত্রের স্বাদ, মেয়েলি মেয়ে যাদের অসহ্য লাগে?

তারা কি তাদের বন্ধুত্বের ক্ষুধা মেটাতে অন্য জগতের দিকে তাকিয়ে দেখবে না? সেখানে যদি এমন কাউকে পায় যার সঙ্গে চিত্তবৃত্তির মিল আছে, তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলেই রসাতলে যাবে

সতীধর্ম্ম ? যে ধর্ম্ম সহজাত সেই তো সতী ধর্ম্ম। তার জন্মে তো চেষ্টা করতে হয় না।

পুরুষ ক'টির মধ্যে কিন্তু অসহিষ্ণুতার বালাই নেই। শশধর যে বেঁচে আছে, এই কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে গেছে গৌরাঙ্গ, এ যেন গৌরাঙ্গর প্রতি শশধরের অশেষ দয়া, আর একান্ত স্নেহের নিদর্শন।

শশধরও কৃতজ্ঞ বৈ কি। কোনোদিন যদি ও ফিরে না আসতো।

বাদলকে চুপিচুপি বাপের সঙ্গে কথা বলতে দেখে শশধর সহাস্যে বলে—কি অতো গোপন কথা হচ্ছে রে বাদল ? বাবার কাছে খুব কষে মামার নিন্দে করছিস বুঝি ?

বাদল লজ্জায় বাপের পিঠের দিকে মুখটা নিয়ে যায়। গৌরাঙ্গ সকৌতুকে বলে—না, ও বলছে যাত্রা পার্টি খুলতে আর বিলম্ব কেন ? আজ রাত্রেই খুলে ফেললে ক্ষতি কি ? ওরে বাস! চিমটি কাটে যে। আহা বাদল বলছে গানের জন্মে আর ভাবনা নেই, বাবুদের বাড়ীর কলের গান শুনে শুনে ও নাকি তিন তিনটে গান শিখে ফেলেছে।

—বলেছে মিথ্যে নয়, আশ্চর্য্য স্মৃতি শক্তি ছেলেটার—শশধর বলে—কদিন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা বাড়ীর ভেতর থেকে ওকে ডেকে নিয়ে যেতো। সেইখানে কলের গান শুনে শুনে কটা যে শিখেছে, গায় ওর মামীর কাছে। সেই গানটা গেয়ে বাবাকে শুনিয়ে দে না বাদল!—বাসন্তীর দিকে একটা কটাক্ষ করে মৃদু হেসে কথাটা শেষ করে শশধর—সেই যে 'শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিললো ঘরে, রাধিকার অন্তরে উল্লাস।'

সে কটাক্ষ বাসন্তী ফিরিয়ে দেয় ভাইবোন দুজনের চোখের উপর।

শশধর সহাস্যে বলে—আপনাদের 'বৃষকেতু'র অভিনয়টা আমার ওপর দিয়েই কতকটা হয়ে গেলো, কি বলেন মাষ্টারমশাই ? তাই না রে বাদল ? কাটা পড়ে জোড়া লাগলাম।

এতোক্ষণে কথঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়েছেন নিভাননী, তাই জামাইকে অবহিত করতেই বোধ করি উর্দ্ধনেত্রে বলেন—সে কথা মিথ্যা নয়।

বাঁচার আশা আর কিছুই ছিলো না। নেহাৎ নাকি মা জয়চণ্ডীকে অনেক পুজোর লোভ দেখিয়েছিলাম তাই ছেলেটাকে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। শশধরের আমার এ এক প্রকার নবজন্ম।

শশধর গৌরাঙ্গর গায়ের ওপর একটুখানি হাতের স্পর্শ রেখে বলে—মা ঠিকই বলেছেন ভাই, ঠিকই বলেছেন, তোর হতভাগা দাদার নবজন্মই ঘটেছে বটে! নবজন্মই ঘটেছে! জানোয়ার থেকে মানুষ জন্ম!

অতোবড়ো একটা দাম্ভিক লোকের এমন করুণ স্বীকারোক্তি উপস্থিত সকলকেই অভিভূত না করে পারে না। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বাসন্তীর বড়ো বড়ো দুটি চোখে টলটল করে বড়ো বড়ো দুটি জলের ফোঁটা! সুধা তো দস্তুরমতো চোখই মুছতে থাকে। আর এই নীরবতাকে ভঙ্গ করতেই বোধ করি বাদল বলে ওঠে—ভবঘুরে পার্টি আর হবে না বাবা! জ্যেঠাবাবু পালার খাতাগুলো সব আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে!

পুড়িয়ে দিয়েছে!

চমকে মুখ তোলে গৌরাঙ্গ, সচকিত হয়ে তাকায় মাষ্টারমশাইয়ের মুখের দিকে। সে খাতাগুলি যে তার মাষ্টারদার কী, তা তো আর অজানা নয়।

মাষ্টারমশাই এ চমকানি গায়ে মাখেন না, উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে অন্য দিকে তাকিয়ে বলেন—হবে না মানে? আলবৎ হবে! দিয়েছি তার কি? দিয়েছি তার কি? আবার আমি লিখতে পারি না ভেবেছিস? সবই তো মুখস্থ আছে আমার, দেখিস না এবার ভালো খাতায় লিখবো, ভালো খাতায়।

হয়তো স্বপ্নবিলাসী মাষ্টারমশাইয়ের এ আশা সম্পূর্ণ দুরাশাও নয়। হয়তো তাঁর ভস্মীভূত কাহিনীগুলিকে আবার নতুন করে লিখে তুলবেন তিনি ভালো খাতায়।

হয়তো জীবনেও কখনো কখনো কারো কারো ভাগ্যে এমন ঘটে, ভাগ্যদেবতার অসতর্ক করুণার অবসরে কারো কারো জীবনের ধ্বংসীভূত কাহিনী আবার নতুন করে লেখা হয়, সে লেখা ভালো খাতায় ওঠে।

কিন্তু সে তো দৈবাৎ।

আসল ভাগ্যদেবতা বড়ো সতর্ক, ফাঁকি দিয়ে কেউ যে জীবনটাকে সহজ করে নেবে, তাঁর সংবিধানে এমন বিধান নেই। সে বিধানের প্রত্যেকটি ধারা আর তা'র প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে বিশদ বুঝিয়ে দেওয়া আছে জীবন কতো জটিল।

তাই টাকার গোছা আর গহনার পুঁটুলি নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসা অপর্ণাকে ফিরে যেতে হয় আত্মপরিচয় গোপন করে। যাকে বাঁচাতে ছুটে আসা, তা'কে যদি গৃহসুখ পরিবেশের মধ্যে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দেখা যায়, তাহলে আর করবার কি আছে?

বাসুলপুরের মাটিতে পা দিতেই কথাটা কানে এল অপর্ণার, সারা গ্রামে যে তখন 'গৌরাঙ্গলীলা'ই কীর্ত্তন হচ্ছে।

ঘরের মানুষ ঘরে ঠাঁই পেয়েছে।

মিথ্যা আতঙ্কে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার আর দিন নেই তার। পথ যদি আবার তার দিকে হাত বাড়াতে চায়, সেটা তো বোকামী।

শুধু বাদলটাকেও যদি একবার দেখতে পাওয়া যেত।

কিন্তু দেখতে চাইলেই যে দেখা দিতে হয়।

যেখানে প্রয়োজন ফুরিয়েছে, যেখানে পরিচয়ের দাবী নেই, সেখানে দেখা দিতে যাওয়ার মত প্রহসন আর কি আছে?

না সে প্রহসনের প্রয়োজন নেই অপর্ণার।

বনস্পতির ইতিহাস রচিত হয়, রচিত হয় না তৃণগুচ্ছের ইতিহাস।

তাঁরাও যে একদা প্রখর সূর্য্য-পিপাসায় ধরিত্রীর বক্ষ ভেদ করে মাথা তুলে ওঠে, সে কথা মনে রাখবার দায়িত্ব কে নেবে ?

তাদের সুখ দুঃখ আশা হতাশা সবই যে নেহাৎ ক্ষুদ্র। তবু তাদের সেই ক্ষুদ্র আশা আর ক্ষুদ্র হতাশা, ক্ষুদ্র অভাব আর ক্ষুদ্র সমস্যা তাদের কাছে যে অনুভূতি নিয়ে আসে সে কি বনস্পতির মহান্ সুখ আর মহতী হতাশার চাইতে কিছু কম তীব্র ? ওদের ক্ষুদ্র চেতনায় এতোটুকু বাতাসের ঝাপটাই যে দুরন্ত কাল বৈশাখীর আস্বাদ দেয়।

যাদের আশার শেষ সীমা হয়তো বা একটা যাত্রার দল খোলা, যারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার জন্যেও এতো বড়ো পৃথিবীতে একটা বিশাল ক্ষেত্র খুঁজে পায় না, সামান্য একটু ব্যবধানের মধ্যেই ঘুরে মরে, আর হয়তো যাদের জীবনের বিয়োগান্ত নাটক পর্য্যবসিত হয় তুচ্ছ একটি মিলনান্তক প্রহসনে, তাঁদের ইতিহাস রচিত হলেই বা গ্রাহ্য করবে কে ? হয়তো অবহেলার হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তবু তেমনি ক'টি অকিঞ্চিৎকর মানুষের কয়েকটি দিনের তুচ্ছ ঘাত প্রতিঘাতের কাহিনী রইলো গাঁথা।

আরো একটি নিতান্ত অকিঞ্চিতকর মানুষের স্বাক্ষর ছিলো এ কাহিনীতে, সে হচ্ছে পাইস হোটেলের রাঁধুনী বামুন। কতোদিন হয়ে গেলো, পার হয়ে গেলো গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ, তবু আজও সে ভরদুপুরে একবার করে হোটেলের পিছনের দরজাটা খুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। দেখে—কেউ সেখানে অপেক্ষা করছে কি না—মাছের আঁশ, পোড়া-কয়লার ছাই, কুটনোর খোসা, আর যাবতীয় আবর্জ্জনার রাশিকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কি না দুটি অন্নের প্রতীক্ষায়।

পাইস্ হোটেলের কদর্য্য অন্ন, তবু বুঝি তার কাছে সে অন্ন পরমান্ন হয়ে উঠতো মানুষের প্রতি মানুষের সহৃদয়তার স্পর্শে, অহেতুক ভালোবাসার স্পর্শে।